প্রকৃতি-পরিচয়

প্রথম ভাগ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকৃতি-পরিচয়

ভূগোল ও বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

(তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য)

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

নিবেদন

অল্পমূল্যে সহজবোধ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক বৎসর পূর্বে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ভূগোল ও বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম অনুসারে "প্রকৃতি-পরিচয়" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পুস্তকে ভূগোল ও বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে ধারাবন্ধভাবে পরিবেষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভুলত্রুটির সংশোধন অথবা বইটির উন্নতিকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে।

যাঁরা এই পুস্তক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীনিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ

মহাকরণ,
কলিকাতা
জানুআরি, ১৯৭৫

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কয়েক বৎসর আগে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেইসব পাঠ্যপুস্তক পরিবেশনও ছিল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে ১৯৭০ সনের জানুআরি মাস থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বই বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া শুরু হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থির হয়েছে যে, ১৯৭৫ সনের জানুআরি মাস থেকে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য সরকার-প্রকাশিত সমস্ত প্রকারের পাঠ্য-পুস্তক বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হবে।

আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের অগণিত ছাত্রছাত্রী এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হবেন ও এই ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

নিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

মহাকরণ
জানুআরি ১৯৭৫

সূচীপত্র

ভূগোল

বিজ্ঞান

ভূগোল

গোড়ার কথা

তোমাদের মধ্যে অনেকে শহরে থাক, আবার কেউ গ্রামেও থাক। আমাদের ভারত মস্ত বড় দেশ। হাজার হাজার গ্রাম আর শহর নিয়ে আমাদের এই দেশ গড়ে উঠেছে। এই সব গ্রাম আর শহর ছাড়াও পাহাড় জঙ্গল, মরুভূমি আছে এই দেশে। এসব জায়গাতেও মানুষ থাকে। সবসুদ্ধু আমাদের দেশে কত লোক আছে জান? প্রায় ৪৬ কোটি লোক এই ভারতে বাস করে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোক। এত লোক আমরা, যদি সবাই ঠিক মতো নিজের নিজের কাজ করে তাহলে অন্য সব বড় বড় দেশের মতো এমন কি তাদের চাইতেও আমরা বড় হতে পারি। দেশকে সবরকমে বড় করতে হলে প্রথম দরকার দেশকে ভালোভাবে জানা।

তোমরা যে জামা, কাপড় বা জুতা পর, সে সব কি তোমরা যেখানে থাক সেখানেই তৈরী হয়? কোথায় ও কিভাবে এই সব জিনিস তৈরী হয়ে তোমাদের কাছে এসে পোঁছোয় সে সব জানবার ইচ্ছে তোমাদের নিশ্চয়ই হয়। ধান, গম, ডাল, আলু, পটল, মাছ বা আরও অন্য দরকারী জিনিস কোথায় হয়, কেমন করে সেখান থেকে বাজারে বা বাড়িতে আসে তা সকলেরই জানা দরকার। শহর বা গ্রামের ভেতর দিয়ে কত রাস্তা চলে গেছে। ঐরাস্তা ধরে চললে কোন্ কোন্ জায়গা দেখতে পাবে বা ঐ রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তাও নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। তোমরা অনেকেই নদী দেখেছ। কোনো নদীর জল একটানা একই দিকে অনবরত বয়ে চলেছে—যেমন কাশীধামে বা হরিদ্বারে। আবার

কলকাতা বা কাছাকাছি জায়গায় যারা গঙ্গা নদী দেখেছ, হয়ত লক্ষ্য করেছ যে গঙ্গার জল একবার একদিকে আবার অন্য সময় অন্যদিকে যাচ্ছে। নদীর জল কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, কেন একদিকে, কেনই বা অন্যদিকে যায় এসব জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছে হয়। গরমের সময় নদীর জল কমে যায়, বর্ষার সময় বাড়ে। শীতকাল, গরমকাল, বর্ষাকাল হয় কেন, শীতের সময় বেশির ভাগ উত্তর দিক্ আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক্ থেকে হাওয়া আসে। এ সবের কারণ কি?

বাস, রেলগাড়ি বা উড়োজাহাজে লোকজন যাওয়া আসা করে, চিঠি-পত্র আসে। এইসব গাড়ি বা উড়োজাহাজ কোথা থেকে আসে, কোথায় কোথায় যায়, যেসব জায়গা থেকে আসছে বা যে যে জায়গায় যাচ্ছে সেসব জায়গা কোথায় এবং কতদূরে এ সব জানবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই হয়। দেশের বা অন্য দেশের এই সব কথা, খাওয়া, পরা, বাড়ি, ঘর, ফল, ফসল কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি জানা যায় ভূগোল পড়লে। এজন্য আজকাল অনেকে ভূগোলকে ভূজ্ঞান নাম দিয়েছেন।

তোমরা যেখানে থাক

শুধু বই পড়ে ভূগোল বা ভূজ্ঞান শেখা যায় না। বই পড়ার সঙ্গে যেসব কথা বইয়ে লেখা আছে সেসব যতটা পারা যায় নিজের চোখে দেখতে হবে আর বুঝতে হবে। এই সব দেখার জন্য প্রথমেই যে খুব দূরে যেতে হবে তা নয়। নিজের বাড়ির আশে পাশে কি আছে তা জানলেও অনেক কিছু শেখা যায়। শহর বল বা গ্রামই বল আমরা অনেকে একসঙ্গে থাকি কেন? একসঙ্গে থাকায় বা একে অপরকে সাহায্য করায় সকলেরই সুবিধে হয়। কোন চাষীর বাড়িতে অনেক ধান বা চাল আছে। কিন্তু শুধু ধান-চাল থাকলেই চলে না। শাকসবজি, মাছ, কাপড়, তেল, ঘি, মসলা সবই লাগে। কাজেই চাষীকে মুদীর কাছে যেতে হয় নুন তেল, মসলা, ঘি ইত্যাদি কিনতে, কিংবা তাঁতীর কাছে যেতে হয় কাপড় কিনতে। ছুতোরের কাছে লাঙল আর কামারের কাছে কাটারি, বঁটি, লাঙলের ফালের জন্য, আবার মুদী, তাঁতী, ছুতোর আর কামারকেও আসতে হয় চাষীর কাছে ধান-চালের জন্য। তেমনি এদের সকলেরই দরকার হয় ডাক্তারের, কবিরাজের বা হেকিমের—অসুখ-বিসুখের সময়। এদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য দরকার হবে মাস্টারমশায় বা দিদিমণির আর পুজো বা অন্য ধর্মকর্মের জন্য লাগে পুরুতমশায়কে। কাজেই পরস্পরের সাহায্য নেবার জন্য মানুষকে একসঙ্গে থাকতে হয়; না হলে খুবই অসুবিধে হয়। ধর, গ্রামে যদি একজনও লেখাপড়া শেখাবার লোক না থাকে তো কত অসুবিধে হয়। পাড়ায় বা শহরে একজন ডাক্তার না থাকলে কত বিপদেই পড়তে হয়। এই সবের জন্যই মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা করে যাতে একে অপরকে দরকার মতো সাহায্য করতে পারে।

গ্রাম ও শহরের লোকের কথা ঃ প্রথমে গ্রামের লোকেদের কথায় আসা যাক। গ্রামে বেশির ভাগ লোকই চাষের কাজ করে। চাষের সময় তারা সকালবেলায় গরু আর লাঙল নিয়ে মাঠে যায়। সারাদিন মাঠে কাজ করে ঘরে ফেরে সেই সন্ধ্যেবেলায়। মাঝে দুপুর বেলায় কিছু খেয়ে একটু জিরিয়ে নেয়। কত কষ্ট করে তারা ধান, গম, ডাল, শাকসবজি জন্মায়। এ সবই যে গ্রামের লোকেরাই খায় তা নয়, চাষীরা এই সব জিনিস শহরেও পাঠায়। শহরের লোকেরা গ্রামের চাষীদের কাছ থেকেই প্রতিদিনকার খাবারের বেশির ভাগ জিনিস পায়।
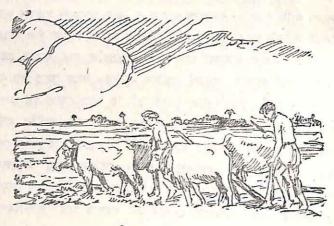
চাষীরা জমি চাষ করছে

কলু—চাষীরা ধান, পাট, শাকসবজির সঙ্গে সরষেরও চাষ করে। কলুরা চাষীদের কাছ থেকে সরষে নিয়ে ঘানিতে পিষে তেল বার করে। সরষে থেকে তেল হয় বলে আমরা বলি সরষের তেল, যা দিয়ে আমাদের রান্না হয়। সরষে ছাড়াও চিনেবাদাম থেকে বাদামের তেল, তিল থেকে তিলের তেল আর নারকেল থেকে নারকেলের তেল হয়। বহুদিন আগে

তিলের তেলই আমরা সকলে রান্নার কাজে লাগাতাম। তেল বা তৈল কথাটা তিল থেকেই এসেছে।
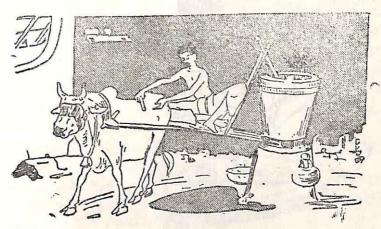
কলু ঘানি চালাচ্ছে

গোয়ালা—গ্রামে অনেক বাড়িতেই গরু থাকে। শহরে দু'চারজন ছাড়া বাড়িতে গরু রাখবার সুবিধে কারুর নেই। দুধ থেকে দই, ছানা, মাখন, ঘি এমনকি ঘোলও তৈরি করে অনেকে বিক্রি করে। গোয়ালারা দুধ, দই, ছানা, মাখন ও ঘি-এর কারবার করে।

গোয়ালা দুধ দুইছে

কুমোর—মাটির হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, খুরি. গেলাস ইত্যাদি যারা গড়ে তাদের কুমোর বলা হয়। এই সব প্রতিদিনের দরকারী জিনিস ছাড়াও কুমোরেরা মাটির খেলনা,

পুতুল আর প্রতিমা তৈরি করে। যেখানে কুমোরেরা থাকে সেখানে দুর্গা-

কুমোর মাটির জিনিস গড়ছে

পুজা, কালীপুজা বা অন্যপুজার আগে বেড়াতে গেলে ঠাকুর গড়া হচ্ছে দেখতে পাবে। কলকাতায় কুমোরটুলি প্রতিমা গড়ার জন্য বিখ্যাত।

কামারশালায় কাজ হচ্ছে

কামার—লোহা দিয়ে কাটারি, কুড়ুল, কোদাল, লাঙলের ফাল প্রভৃতি নানারকম জিনিস কামারের তৈরি করে। কামারেরা যে ঘরে বা জায়গায় ঐ সব জিনিস তৈরি করে তাকে কামারশালা বলে। কামারশালায় গেলে দেখবে কিভাবে লোহা আগুনে গরম করে লাল হয়ে গেলে হাতুড়ি দিয়ে সেই লোহা পিটে কামারেরা নানারকম লোহার জিনিস তৈরি করছে বা মেরামত করছে।

তাঁতী—তাঁত একরকম যন্ত্র যাতে সুতা দিয়ে কাপড়, গামছা, চাদর ইত্যাদি বোনা যায়। যারা তাঁত চালায় তাদের তাঁতী বলে। আজকাল বেশির ভাগ কাপড়ই বড় বড় কলে তৈরি হয়। কলকাতার কাছে কিছু কাপড়ের কল দেখা যায়।

তাঁতে কাপড় বোনা হচ্ছে

ছুতোর—কাঠ দিয়ে দরজা, জানলা, চেয়ার, টেবিল, চৌকি, গরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি তৈরী হয়। যারা এই সব কাঠের জিনিস তৈরী করে বা সারায় তাদের ছুতোর বলে। ছুতোরেরা কত রকমের যন্ত্র ব্যবহার করে তা হয়ত তোমরা দেখে থাকবে।
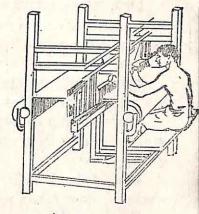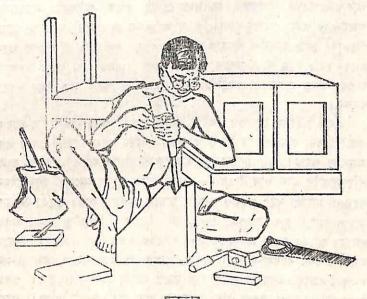
ছুতোর

ধোপা, নাপিত—আমাদের জামা, কাপড় কেচে পরিষ্কার করে ধোপা. আর চুলকাটা ইত্যাদি ছাড়াও বিয়ে, পৈতে বা মুখেভাতে নাপিত লাগে। তোমরা সকলেই ধোপা বা নাপিত কি কাজ করে নিশ্চয়ই জান।

জেলে—পুকুর, খাল, বিল বা নদীতে জাল দিয়ে জেলেরা মাছ ধরে।

সেকরা, কাঁসারী—সোনারুপোর গয়না তৈরি করে সেকরা। কাঁসা আর পেতলের জিনিস তৈরি করে কাঁসারী।

ময়রা, মুদী—ময়রা নানারকমের মিঠাই ও খাবার তৈরি করে বিক্রি করে। দোকানে যারা তেল, নুন, চাল, ডাল, মসলা ইত্যাদি বিক্রি করে তাদের মুদী বলে।

ঘরামি, রাজমিস্ত্রী—ঘরামি খড়ের বা মাটির ঘর আর রাজমিস্ত্রী পাকা বাড়ি তৈরি বা মেরামত করে।

গ্রামের অন্যান্য লোক—ঠাকুর পুজা করার জন্যে, বিয়ে, পৈতে, মুখে ভাত দেবার জন্যে পুরুতমশায়কে দরকার। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই পুরুতমশায়দের দেখেছ। মুসলমান-প্রধান গ্রামে মৌলবী সাহেবেরা আছেন ঐ রকম কাজের জন্য। গ্রামে পাঠশালা বা মক্তবে মাস্টারমশায়রা পড়ান। গ্রামে থেকেও অনেকে শহরে চাকরি, ওকালতি বা ব্যাবসা করে থাকেন। এ'দের মধ্যে সম্ভব হলে অনেকে রোজই গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া আসা করেন বা ছুটির সময় গ্রামে আসেন, অন্য সময় শহরে থাকেন।

এবার শহরের লোকের কথায় আসা যাক। গ্রামে যেমন চাষ-আবাদ করাই প্রধান কাজ শহরে কিন্তু তা নয়। শহরে অনেক বেশী লোক এক জায়গায় থাকে। এত লোকের খাবার কোথা থেকে আসে? চাল, ডাল, তরিতরকারি, মাছ, দুধ, ইত্যাদি—গ্রাম থেকেই শহরে আসে। গ্রাম যেমন শহরকে সাহায্য করে শহরও তেমনি গ্রামকে সাহায্য করে। ভালো ডাক্তার, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এসব থাকে শহরে। গ্রামের লোক এ সবের জন্য শহরের ওপর নির্ভর করে। শহরে কল-কারখানা, ব্যাবসা-বাণিজ্য থাকায় গ্রামের লোকেরা শহরে এসে এ সব কাজে নিজেদের লাগাতে পারে আর তাতে ভালো রোজগারও হয়। গ্রামে যেমন বেশির ভাগ রাস্তা কাঁচা, শহরের প্রায় সব রাস্তাই পাকা। কত-

রকমের বাড়ি, গাড়ি, বাস, রিক্সা ও দোকানপাট ইত্যাদি শহরে দেখা যায়।

বাড়ি-ঘর—গ্রামের বাড়ি বেশির ভাগই উচু জায়গায় থাকে। আশে-পাশের জমি একটু নিচু। গ্রামের বাড়িগুলোর চারদিকের এই নিচু জমিতে চাষ-আবাদ হয়, কোনো গ্রামে বাড়িগুলো কাছাকাছি এক সঙ্গে
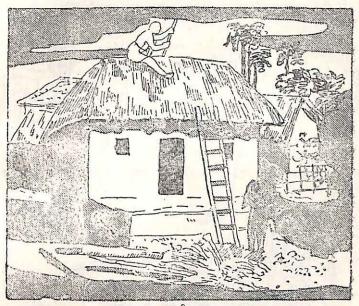
খড়ের ঘরে ঘরামি কাজ করছে

থাকে, কোনো গ্রামে আবার লম্বা লাইনের মতো এক সারিতে থাকে। বেশির ভাগ বাড়ির দেয়াল মাটির আর চাল খড়ের বা গোলপাতার। গ্রামে যাদের অবস্থা একটু ভালো তাদের বাড়ির দেয়াল ইটের আর চাল খোলার, টালির বা টিনের। কিছু কিছু পাকা বাড়িও অনেক গ্রামে দেখা যায়। পাহাড়ে জায়গায় প্রায়ই খুব বন জঙ্গল দেখা যায়। ঐ সব জায়গায় বন থাকায় অনেক কাঠ পাওয়া যায়। পাহাড়ী জায়গায় যে সব বাড়ি দেখা যায় তাদের মেঝে, দেয়াল আর ছাদ কাঠের তৈরী। তোমরা

আমাদের দেশে বেশির ভাগ সময়ই গরম, সেজন্য অনেক কাপড়-জামার দরকার হয় না। শীত খুব বেশী পড়ে না বলে শীতের সময় গরম চাদর হলেই চলে যায়। অবশ্য চাদর ছাড়া অনেকেই পশমের সোয়েটার, শার্ট, পাঞ্জাবি, কোট ও প্যান্ট ব্যবহার করে।

কোন্ কোন্ জিনিস হয়—আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই চাষ-আবাদ করে। এর মধ্যে ধানের চাষই প্রধান। ধান ছাড়া গম, জোয়ার, বাজরা আর ভুট্টার চাষও হয়। ধান থেকে চাল আর চাল থেকে ভাত হয়। আমরা বাংলাদেশের মানুষ যেমন ভাত খেতে পছন্দ করি ভারতের অনেক জায়গার লোকেরা গমের, জোয়ারের, বাজরার বা ভুট্টার আটার রুটি খেতে ভালোবাসে। এ ছাড়াও দেশে নানারকম ডাল, সরষে, আখ, তামাক, পাট ইত্যাদির চাষ হয়। আনাজের মধ্যে আলু, রাঙা আলু, পটল, কুমড়ো, ঝিঙে, বেগুন, কপি, মুলো, টমাটো, গাজর, বীট আর নানা রকমের শাক জন্মায়। ফলের মধ্যে আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, আতা, ফুটি ইত্যাদি অনেক জন্মায়। মালদা জেলার আম আর দার্জিলিং জেলার কমলালেবু ও চা বিখ্যাত।

শুধু চাষ-আবাদ করেই আমাদের দেশের সব লোক দিন কাটায় না। অনেকে কাপড়, গামছা, চাদর বোনে, কেউ বা বাসন বা পুতুল তৈরি করে আবার কেউ সোনা রূপোর জিনিস বা কাঠের জিনিস তৈরি করে।
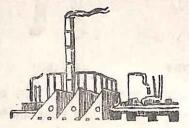
বড় কারখানা

শহরের দিকে, বিশেষ করে কলকাতা, হাওড়া, শ্রীরামপুর ইত্যাদি গঙ্গার দুধারের বড় বড় শহরে নানা রকমের কলকারখানা তৈরী হয়েছে। ঐ সব বড় বড় কলে বা কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করে।

পাটের তৈরি জিনিস, যেমন চট বা থলে, কাপড়, লোহার জিনিস, ওষুধ, সাবান, নানা রকমের যন্ত্রপাতি, ময়দা, দেয়াশলাই, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য—আগেই বলেছি গ্রামে চাষীরা যে সব ফল-ফসল জন্মায় সে সমস্তই তাদের নিজেদের দরকার হয় না। নিজেদের দরকারের বেশী যে সব জিনিস থাকে, সে সব হাটে বা বাজারে বিক্রি করে চাষীরা অন্য দরকারী জিনিস কিনে আনে। গ্রামে সপ্তাহে একদিন, দুদিন বা কোন জায়গায় প্রতিদিনই হাট বসে। মাথায়, বাঁকে করে বা

গ্রামের হাট

গরুর গাড়িতে চাষীরা বেচবার ফল-ফসল নিয়ে আসে। চাষী ছাড়া অন্যরা আবার নুন, তেল, মসলা, কাপড়, গামছা, খেলনা, হাঁড়ি, কলসী বা অন্য জিনিসও নিয়ে আসে বেচবার জন্য। অনেকে হাটের দিনে শহর থেকে মালা, ফিতে, আরশি, হারিকেনের আলো ইত্যাদি নিয়ে এসে হাটে বিক্রি করে। শহরে লোক অনেক, তাদের দরকারও বেশী, তাই শহরে রোজই বাজার বসে।

শহরে আর ফল-ফসল, তরিতরকারি বা মাছ ইত্যাদি হয় না। কাজেই
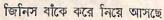
জিনিস বাঁকে করে নিয়ে আসছে

জিনিস মাথায় করে নিয়ে আসছে

গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি, রেলগাড়ি, মোটর লরি, নৌকো বা স্টীমারে করে ঐ সব জিনিস শহরে আসে।

জিনিস গরুর গাড়ি করে নিয়ে আসছে

গ্রামে কাপড়, জামা, চট, থলে, ময়দা, চিনি, ওষুধপত্র বা কলে তৈরী অন্য অনেক জিনিস শহর থেকে আসে। গ্রাম থেকে শহরে আর
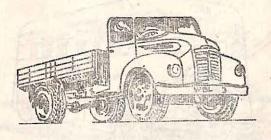
মোটর লরি

শহর থেকে গ্রামে অনবরত জিনিস দেওয়া-নেওয়া চলছে। জিনিসপত্রের এইরকম দেওয়া-নেওয়াকে বলা হয় ব্যাবসা-বাণিজ্য। যারা এইরকম কাজ করে নিজেদের সংসার চালায় তাদের বলা হয় ব্যাবসায়ী।

পালকি

আসা-যাওয়ার উপায়ঃ লোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসা-যাওয়া করে। কি রকম করে তারা গ্রাম থেকে গ্রামে, বা শহরে

যায়? কাছাকাছি হলে সকলেই হে'টে যায়। দূরে যেতে হলে গ্রামে
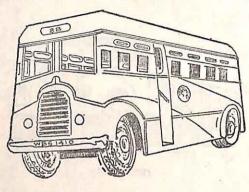
মোটর বাস

পালকি, গরুর গাড়ি বা মোষের গাড়ি করে যায়। আজকাল ভালো রাস্তা

সাইকেল রিক্শা

হওয়ায় সাইকেল রিক্শা, ঘোড়ার গাড়ি বা মোটর বাসে আসা-যাওয়া করা যায়।

কোন কোন গ্রামে নদী আর খাল খুব বেশী থাকায় রাস্তা তৈরি করার অসুবিধা হয়। ঐ সব গ্রামের লোকেরা নৌকো করে এক জায়গা

নৌকো

থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া-আসা করে বা মালপত্র নিয়ে যায় বা

স্টীমার

আসে। বড় বড় নদীতে স্টীমার আর মোটর লঞ্চ চলে।

তোমরা নিশ্চয়ই রেলগাড়ি দেখে থাকবে। রেলগাড়ি করে লোকেরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়াতাড়ি যেতে পারে বা মালপত্রও নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য মোটর বাস আর মোটর লরিও খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারে।
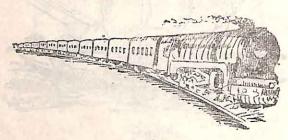
রেলগাড়ি

তোমরা অনেকেই আকাশে এরোপ্লেন উড়তে দেখেছ। এরোপ্লেনে করে খুব দূরের জায়গায় অনেক কম সময়ে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে
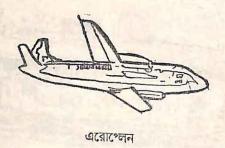
এরোপ্লেন

দিল্লী প্রায় ৯০০ মাইল, এরোপ্লেনে ৩ ঘণ্টায় ৯০০ মাইল যাওয়া যায়। এমন এরোপ্লেনও আছে যাতে এর থেকেও কম সময়ে অতটা পথ অতিক্রম করা যায়।

উত্তর লেখ

(নিজ গ্রামে ঘুরে ঘুরে সব খবর নিয়ে উত্তর লিখতে হবে)

১। তোমাদের গ্রামের লোকেরা কি কি কাজ করে। বেশির ভাগ লোক কোন্ কোন্ কাজ করে ?

২। তোমাদের গ্রামে স্কুল আছে কি ? যদি থাকে তাহলে তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে কত সময় লাগে আর কোন্ দিকে যেতে হয় ? স্কুলে তোমরা কয়জন পড় ? মাস্টারমশায় কয়জন ?

৩। তোমাদের গ্রামে কোন্ কোন্ জিনিসের চাষ হয় ? ঐ সব জিনিসের মধ্যে কি কি হাটে বিক্রি হয় ? তোমাদের গ্রামের কি কি জিনিস অন্য গ্রামে বা শহরে যায় ? অন্য গ্রাম বা শহর থেকে কি কি জিনিস তোমাদের গ্রামে আসে ? কোন্ কোন্ দিনে হাট বসে ?

৪। চাষী, কামার, কুমোর আর ছুতোর যে যে জিনিস কাজের জন্য ব্যবহার করে তার অন্তত একটি করে ছবি এঁকে দেখাও।

৫। তোমাদের গ্রামে কত রকমের ঘরবাড়ি আছে ?

৬। গ্রামের লোকেরা কিভাবে অন্য গ্রামে বা শহরে যাওয়া-আসা করে ?

৭। তোমাদের গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি কি কি কারখানা আছে ? কোন্ কোন্ জিনিস ঐ সব কারখানায় তৈরী হয় ?

পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তারা

পৃথিবী কি রকম দেখতে ঃ খোলা বড় মাঠে দাঁড়িয়ে যদি চারিদিকে তাকানো যায় তবে মনে হবে যে পৃথিবীর উপরটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা টেবিলের উপরের মতো সমান বা সমতল। সত্যিই যদি পৃথিবীর উপরটা সমান হত তাহলে টেবিলের যেমন এক একটা ধার বা কিনারা আছে পৃথিবীরও ঐ রকম একটা কিনারা পাওয়া যেতো। কিন্তু পৃথিবীর ওরকম কোনো শেষ কিনারা নেই। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে ইউরোপ
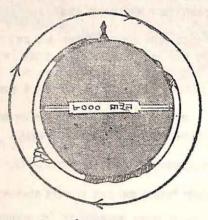
পৃথিবী গোল

মহাদেশ থেকে কয়েকজন লোক পালতোলা জাহাজে চড়ে বরাবর পশ্চিম-দিকে যেতে যেতে আবার ঘুরে নিজের দেশে ফিরে আসেন। এরোপ্লেনে চড়ে আজকাল একই দিকে চলতে চলতে আবার সেই যে জায়গা থেকে যাওয়া শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে আসা যায়। পৃথিবী গোল বলেই এটা সম্ভব। অনেক উঁচু বা নিচু জায়গা আছে পৃথিবীর উপর; যেমন আমাদের হিমালয় পর্বত পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পৃথিবী কত বড় জান কি? একটা ফুটবলের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা কাঠি চালিয়ে দিলে বলটাই এক পিট থেকে অপর পিঠ কত দূরে

জানা যায়, ঐ রকম পৃথিবীর এক পিঠ থেকে আর এক পিঠ সোজাসুজি প্রায় আট হাজার মাইল। পৃথিবীটা তাহলে কত বড় একটা বলের মতো ভাবতে পার?

দিন আর রাত ঃ সকালে পূর্বদিকে সূর্য ওঠে। বেলা যত বাড়ে সূর্য তত উপরে উঠতে থাকে। ঠিক দুপুর বেলায় সূর্য সবচেয়ে বেশী উপরে থাকে। পরে আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে নেমে যায়। যখন সূর্যকে আর দেখা যায় না তখন সন্ধ্যা হয়, আর তার কিছু পরে অন্ধকার বাড়লে রাত্রি হয়। পরদিন ভোর বেলায় আবার সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং আগের দিনের মতো সন্ধ্যার সময় অস্ত যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এরকম হচ্ছে। রাত্রে চাঁদ আর অগুনতি তারা ওঠে,—আবার অস্ত যায়। এইসব দেখে মনে হয় না কি যে সূর্য, চন্দ্র আর তারা পৃথিবীর চারদিকে সব সময়েই ঘুরছে? কিন্তু তা নয়। তোমরা যদি দু হাত বাড়িয়ে এক জায়গায় অনবরত ঘুরপাক খাও দেখবে চারদিকের বাড়িঘর, লোকজন, গাছপালা সবই যেন তোমাদের উল্টো দিকে ঘুরছে। কিছুকাল ঘোরার পর তোমরা যে ঘুরছ তা মনে হবে না, তোমাদের চারিদিকের সব জিনিস যেন তোমরা যে দিকে ঘুরছ তার উল্টো দিকে ঘুরছে এই রকম মনে হবে। রেলগাড়ি যখন চলে তখন গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় রেললাইনের পাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা যেন অপর দিকে ছুটে চলেছে। পৃথিবীর বেলাতেও ঐ রকম হয়। পৃথিবী এক দিন আর এক রাত্রি বা পুরো ২৪ ঘন্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পুরো একপাক ঘুরে চলেছে। একে বলে পৃথিবীর আবর্তন বা আহ্নিক গতি। পৃথিবীর নিজের এই পাক খাওয়ার দরুনই তোমরা সূর্য, চন্দ্র আর তারাদের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরতে দেখ। একটা রেল-গাড়ির মধ্যে থেকে বাইরের দিকে না তাকালে গাড়ি চলা বুঝতে পারা যায় না, আর এত-বড় পৃথিবীতে থেকে আমরা পৃথিবী ঘোরা কি করে বুঝব? অথচ তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে একথা জানলে যে পৃথিবী কত জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে। যারা পৃথিবীর মাঝখানে, মানে বিষুবরেখার উপরে আছে তারা ঘন্টায় প্রায় ১০০০ মাইল জোরে পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে।

বাতি আর বল নিয়ে পরীক্ষা ঃ অন্ধকার ঘরে টেবিল বা মেজের উপর একটি মোমবাতি রাখ। মনে কর মোমবাতি থেকে যে আলো আসছে সেটা যেন সূর্যের আলো। পৃথিবী গোল, কাজেই একটা গোল জিনিস, যেমন একটা রবারের বল, ঐ বাতির সামনে একটা কাঠিতে বিঁধে আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাক। বলের যে দিক্‌টা বাতির দিকে থাকবে, সেখানে আলো পড়বে, আর বলটার অন্য দিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে। দেখবে বলের আধখানা আলো আর বাকী আধখানা অন্ধকার রয়েছে। ঠিক এই রকম করে সূর্যের সামনে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর যে আধখানা সূর্যের আলো পায়, সেখানে তখন দিন, আর যেখানে আলো পড়ে না সেখানে তখন রাত্রি। পৃথিবী যদি না ঘুরে স্থির থাকত, তাহলে পৃথিবীর একটা দিকে হত সব সময়ই দিন আর অন্য দিকটায় সব সময় রাত্রি। পৃথিবীর সব জায়গায় পরপর দিনরাত্রি হয়ে চলেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবী অনবরত ঘুরছে।

গ্লোব বা ভূগোলক নিয়ে পরীক্ষা ঃ পৃথিবীর নানা জায়গায় কি ভাবে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা রাত্রি হয় সেটা ভালোভাবে বুঝতে গেলে একটা গ্লোবের দরকার। গ্লোব পৃথিবীর একটা খুব ছোট নমুনা যার উপর নানা দেশ, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি আঁকা রয়েছে। পৃথিবী কি ভাবে নিজের মেরুদন্ডের উপর ঘুরছে, গ্লোবটি ঘোরালে সহজেই তা বুঝা যায়। কিন্তু যেমন গ্লোব একটা কাঠির চারদিকে ঘোরান হয়—যেন কাঠিটাই মেরুদন্ড তেমনি পৃথিবীর ঘোরা বুঝবার জন্য কাঠির বদলে একটা রেখা মনে মনে ঠিক করে নেওয়া হয়। ঐ রেখা বা লাইনকেই বলা হয় মেরুরেখা বা পৃথিবীর মেরুদন্ড। তোমরা দেখতে পাবে গ্লোবের কাঠিটা ঠিক খাড়াভাবে নেই, গ্লোবটা একটু হেলান অবস্থায় ঘোরে। পৃথিবীও কাত হয়ে অনবরত তার মেরুরেখার উপরে ঘুরে চলেছে।

গ্লোবের উপরে আর নিচে যে দু জায়গায় কাঠিটা ফুঁড়ে বের হয়েছে সেই দুটো জায়গাকেই মেরু বলে—উপরে উত্তরমেরু আর নিচে দক্ষিণ-মেরু। পৃথিবীরও ঠিক এরকম দুটি মেরু আছে, তাদের নামও উত্তর-মেরু এবং দক্ষিণমেরু। এই দুই মেরু থেকে সমান দূরে পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা গোল রেখা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে এরকম মনে

ধলে ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। এই রেখাকে বলা হয় বিষুবরেখা। বিষুবরেখার উত্তর দিক্‌টা উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ দিকটা দক্ষিণ গোলার্ধ। গ্লোবে দেখতে পাবে আমাদের পশ্চিম বাংলা বিষুবরেখার উত্তর দিকে, অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

বলের বদলে গ্লোবটা যদি বাতির সামনে রাখ তাহলে কোন্‌ কোন্‌ দেশে একই সময়ে দিন বা রাত হচ্ছে, তা বোঝা যাবে।
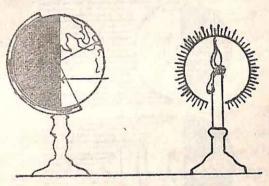
বল বা গ্লোব দিয়ে দিনরাত্রি দেখানো

আগে বলেছি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। গ্লোবটাকে ঐ ভাবে বাঁদিক থেকে ডান দিকে আস্তে আস্তে ঘোরালে গ্লোবের যেখানে আলো খাড়াভাবে পড়ে, সেখানকার দাগ আর লেখাগুলো খুব স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ জায়গায় তখন দুপুর। গ্লোবের বাঁদিক বা পশ্চিম দিকে তখন সকাল, ঐ জায়গায় দেখ আলোর জোর কমে গেছে। আর গ্লোবের ডানদিকে আলোর শেষ সীমানা যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে তখন সন্ধ্যা। গ্লোবের যে জায়গাটায় দুপুর তার ঠিক উল্টো দিকে অন্ধকার জায়গাটায় তখন মাঝরাত্তির। আগে যেটা বলা হল তাতে একই সময়ে পৃথিবীর কোথাও সকাল, কোথাও দুপুর বা কোথাও সন্ধ্যা হচ্ছে এইটাই বোঝান হয়েছে। আচ্ছা একই জায়গায়, ধর বাংলাদেশে কি করে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ইত্যাদি হবে ? গ্লোবটাকে ডানদিকে ঘোরাতে থাক তাতে বাংলাদেশ বাঁদিকের শেষ প্রান্তে যেখানে মোমবাতির আলোর শেষ

সীমানা রয়েছে সেখানে আসে। সে সময় তাহলে ভোরবেলা বা সকাল। আরও ডানদিকে ঘোরালে গেলোবের বাংলাদেশ ক্রমশ আরও আলো পাবে আর রেখাগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে। বাংলাদেশের যে জায়গাটা যখন ঠিক আলোর দিকে আসবে তখন সেখানে দুপুর। আরও ডানদিকে ঘোরালে আলোর জোর কমতে থাকবে, তার মানে বিকেল হচ্ছে।
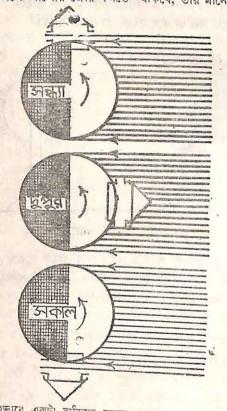
কিভাবে একটা বাড়িতে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা হয়

আর ডানদিকে ঘোরালে আলোর ডানদিকের শেষ সীমানায় বাংলা দেশ এসে পড়বে। আরও ঘোরালে আলোর উল্টোদিকে অন্কার এসে যাবে।

তার মানেই সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি এসে গেল। আরও ঘোরালে আবার প্রথম যেখানে শুরু করেছিলে সেই সকালবেলা দেখতে পাবে। এই ভাবে দিনের পর দিন সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি ইত্যাদি হয়ে চলেছে।

ছায়াকাঠি ঃ আলোর সামনে কোনো জিনিস থাকলে আলোর উল্টো-দিকে সেই জিনিসের ছায়া পড়ে। আলোটা যদি জিনিসের সঙ্গে একই তালে থাকে তবে ছায়াটা হয় লম্বা। আর আলো যতই উপরের দিকে ওঠান যায় ছায়াটা ততই ছোট হতে থাকে। এ জন্যে সকাল বা বিকালে সূর্য যখন পূর্ব বা পশ্চিম দিক্‌-সীমানার কাছাকাছি থাকে তখন—গাছ, মানুষ, লাঠি বা অন্য জিনিসের ছায়া বেশ লম্বাভাবে হয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়, সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে আলো দেয় তখন ছায়া সব থেকে ছোট হয়। দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন্ জিনিসের ছায়া দেখে কি জানা যায়, সেটা দেখা যাক।

কোনো খোলা জায়গায় যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে, সেখানে কয়েক হাত লম্বা একটা সোজা কাঠি বা লাঠি ঠিক খাড়াখাড়ি ভাবে পোঁত। দেখতে পাবে আকাশে সূর্যও যে রকম চলছে ঐ কাঠি বা লাঠির ছায়াও সেই রকম সরে যাচ্ছে, সকালে ছায়া থাকে পশ্চিম দিকে, বিকেলের দিকে তা পূর্ব দিকে সরে আসে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঐ কাঠির ছায়ার একেবারে শেষের দিক্‌টা একঘণ্টা পর পর চক বা অন্য কিছু দিয়ে মাটির ওপর দাগ দাও। এই ভাবে দাগ দিয়ে গেলে দেখবে যে কাঠির ছায়া ছোট হতে হতে ঠিক দুপুরে সবচেয়ে ছোট হয়। তারপর আবার বড় হতে থাকে। সারা বছরের ছায়ার পথ এইভাবে লক্ষ্য করলে কি কি বোঝা যাবে নিচে দেওয়া গেল ঃ

(১) ঠিক দুপুরবেলা ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়েছিল, সেই সময় সূর্য কাঠির ঠিক মাথার ওপর ছিল।

(২) পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে বা বিষুবরেখার উত্তরে ছায়া উত্তর দিকে পড়ে। উত্তর দিক জানা হলে অন্য দিক্‌গুলি ঠিক করা যায়।

(৩) কাঠির ছায়া দেখে মোটামুটি সময় ঠিক করা যায়। গ্রামে অনেকেই গাছ, খুঁটি বা ঘরের চালের ছায়া দেখে সময় আন্দাজ করে।

(৪) সারা বছর ছায়ার পথ একরকম থাকে না। গ্রীষ্মকালে আর

শীতকালে লক্ষ্য করলে ছায়ার আলাদা আলাদা পথ দেখতে পাবে। ঠিক দুপুরবেলার যে ছায়া সেও গ্রীষ্মকালে আর শীতকালে বা অন্য সময়ে বড় বা ছোট হয়। শীতকালে ঠিক দুপুরবেলার ছায়া গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলার ছায়া থেকে লম্বা। শীতকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধে আকাশেতে দক্ষিণ দিকে একটু বেশী হেলে থাকে সেইজন্য ছায়া বেশী লম্বা হয়। এইজন্যই শীতকালে দক্ষিণ দিকের জানলা বা দরজা দিয়ে রোদ্র ঘরের অনেকখানি ভেতরে আসে, এ তোমরা হয়তো দেখে থাকবে।

হাওয়া-নিশান ঃ পৃথিবী যেমন গোল ঠিক ঐ রকম গোল ও বেশ পুরু বাতাসের একটা আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। বাতাসের এই আবরণ বেশ কয়েক মাইল ঘন। আমরা এই ঘন হাওয়ার আবরণকে বায়ুমন্ডল বলি। হাওয়া চোখে দেখা যায় না। কিন্তু হাওয়া যে আছে তা বোঝা যায়, গাছের ডাল বা পাতা যখন নড়ে, কোনো হাল্কা জিনিস—যেমন তুলো, বেলুন, ফানুস যখন উড়ে যায় এবং আমাদের গায়ে যখন বাতাস লাগে।
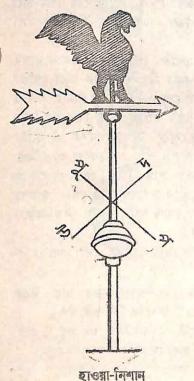
হাওয়া-নিশান

বছরের সব সময় একই দিক্ থেকে হাওয়া আসে না। কলকাতার কাছাকাছি জায়গায় সাধারণত গরমকালে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে আর শীতকালে উত্তর বা উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে বাতাস আসে। ধোঁয়া, বেলুন, ফানুস কোন্ দিকে যাচ্ছে বা ঘুড়ি কোন্ দিকে উড়ছে দেখে বাতাসের দিক্ ঠিক করা যায়। একরকম যন্ত্র দিয়েও হাওয়া কোন্ দিক থেকে আসছে আর কত জোরে বয়ে যাচ্ছে তা

জানা যায়। এই যন্ত্রকে হাওয়া-নিশান বা হাওয়া-মোরগ বলে। দেখ না, পাশের ছবিতে যন্ত্রটার ওপর কেমন একটা মোরগ বসান রয়েছে।

টিনের পাতের তৈরী তীর আর মোরগটি এমনভাবে উপরে বসান আছে যে সামান্য বাতাস লাগলেই তীরসুদ্ধ মোরগটা ঘুরতে থাকে। তীর আর মোরগের মুখ সরু কিন্তু পিছনের দিক্‌টা বেশ চওড়া। এইজন্যই তীরের আর মোরগের পিছনে বাতাসের ধাক্কা বেশী লাগে। ফলে বাতাস যেদিক্ থেকে আসে ঐ দুটোরই পিছনের দিক্‌টা বাতাসের ধাক্কায় উল্টো দিকে ঘুরে যায়। যে দিক্ থেকে বাতাস আসে তীর আর মোরগের মুখ সেইদিকে হয়ে যায়। কাজেই তীর আর মোরগের মুখ দেখেই বাতাস কোন্ দিক্ থেকে আসছে সেটা বোঝা যায়। তীরের নিচের শিক চারটে দিয়ে দিক্ দেখান হচ্ছে।

আবহাওয়া ঃ তোমরা যে শহর বা গ্রামে থাক সেখানে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে কোনো একদিন হয়তো বেশ গরম অথচ পরের দিন সেরকম গরম নয়। এক রাত্রে যত ঠান্ডা পরের রাত্রিতে তত ঠান্ডা নাও হতে পারে। একদিন বেশ জল বা ঝড়বৃষ্টি হল, পরের দিন বেশ শুকনো গেল। প্রত্যেকদিনই এক একরকম জল হাওয়া দেখা যায়। আবার একই দিনে এক সময় খুব গরম অন্য সময় ঠান্ডা। এক সময় ঝড় হচ্ছে অন্য সময় হাওয়া বেশ শান্ত। প্রত্যেক দিনের বা দিনের কোনো সময়ের জল-হাওয়ার অবস্থাকে ঐ জায়গার ঐ দিনের বা ঐ সময়ের আবহাওয়া বলে। সাধারণত বিকালের বা ভোরের দিকে গরম কম থাকে। দুপুরে গরম বেশী হয়। এর কারণ কি জান? দুপুরবেলা সূর্যের আলো খাড়াভাবে আসে কিন্তু সন্ধ্যায় বা সকালবেলায় সেরকম ভাবে পড়ে না। খাড়া বা সোজাসুজি-ভাবে রৌদ্র যে জায়গার উপর পড়বে সে জায়গা অল্প সময়ের মধ্যেই গরম হয়ে উঠবে।

দিনের জল-হাওয়ার এরকম পরিবর্তন যেমন দেখা যায় সেরকম বছরের বিশেষ বিশেষ সময় আবহাওয়ার পরিবর্তনও দেখা যায়। গ্রীষ্মকাল বা গরমের সময় বললে আমরা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের কথাই ধরি। আষাঢ়-শ্রাবণ বছরের এমন একটা সময় যখন খুব বৃষ্টি হয় ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থাকে। কুয়াশা ও উত্তরদিক্ থেকে ঠান্ডা হাওয়া আমাদের পৌষ-মাঘ মাসের

কথাই মনে করিয়ে দেয়। যদি দিনের রোজনামচা লেখা অভ্যেস কর তবে তার সঙ্গে প্রত্যেকদিন কি রকম গরম, বৃষ্টি, হাওয়া, মেঘ, কুয়াশা, ঝড় ইত্যাদি হয় তা লিখতে পার। এভাবে তোমরা যে জায়গায় থাক তার প্রতিদিনকার মোটামুটি আবহাওয়ার বিবরণ লেখা হয়ে যাবে।

গ্রহ ঃ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী সূর্যের একটা গ্রহ। সূর্যকে যদিও ছোট দেখায় কিন্তু সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। খুব দূরে আছে বলেই অত ছোট দেখায়। পৃথিবীর মতো আরও কয়েকটা গ্রহ এক একটা পথ ধরে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরে চলেছে। এদের মধ্যে সূর্যের সব চেয়ে কাছের গ্রহ হল বুধ; তারপর শুক্র তারপর পৃথিবী। পৃথিবীর পর মঙ্গল আর তারপর বৃহস্পতি। বৃহস্পতি গ্রহদের মধ্যে সব থেকে আকারে বড়। বৃহস্পতির পর আরও চারটি গ্রহ আছে—শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। গ্রহদের নিজেদের কোনো আলো নেই—সূর্যের আলোয় এরা আলো পায়।

সূর্য, পৃথিবী আর চন্দ্র
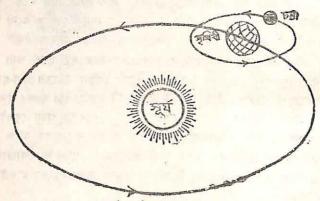
পৃথিবীর সব চাইতে কাছে হচ্ছে চাঁদ। পৃথিবী যেমন সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, চাঁদও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এইজন্যই চাঁদকে বলে উপগ্রহ। কেন না পৃথিবী একটা গ্রহ কিন্তু তার চারদিকে যে ঘুরছে তাকে তো আর পৃথিবীর মতো গ্রহ বলা ঠিক নয়। চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতেই তার আলো। ঐ আলোরই কিছু

পৃথিবীতে এসে পড়ে যাকে আমরা বলি জ্যোৎস্না। পৃথিবীর আলোও চাঁদের উপর পড়ে। প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চাঁদের যে অন্ধকার জায়গাটা সহজে নজরে আসে না দূরবীন দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে সেখানেও অল্প আলো আছে। ঐ আলো পৃথিবীর আলো।

তারা ঃ আকাশে গ্রহ মাত্র কয়েকটা কিন্তু নক্ষত্র বা তারা যে কত আছে তা গুনে শেষ করা যায় না। রাত্রে, বিশেষ করে যখন আকাশে চাঁদ থাকে না, তখন তারাগুলিকে ভালোভাবে দেখা যায়। এই সব নক্ষত্র দেখতে ছোট হলেও আসলে কিন্তু খুবই বড়—এত বড় যে তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। এদের মধ্যে অনেক তারা সূর্যের চেয়েও বড়। তবে এত ছোট দেখায় কেন ওদের? সূর্য যেমন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আছে বলে ছোট দেখায়, যদিও আসলে পৃথিবীর চেয়েও অনেক গুণ বড় তেমনি তারাগুলি সূর্য থেকে আরও অনেক দূরে, কাজেই সূর্যের চেয়ে অনেক বড় হলেও ওদের অত ছোট দেখায়। তোমরা শুনে একটু অবাক্ হবে হয়তো যে, সূর্যও একটা তারা। তবে অন্য তারাদের থেকে পৃথিবীর কাছে আছে বলে বড় দেখায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডল আর ধ্রুবতারা

এবার কয়েকটা বিশেষ নক্ষত্র সম্বন্ধে বলা যাক।

সপ্তর্ষিমন্ডল আর ধ্রুবতারা ঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার পর উত্তর

দিকের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে কয়েকটা তারা বেশ স্পষ্ট আর বড় দেখতে পাবে। এদের ভেতর সাতটি তারাকে যেন একটা বিরাট্ জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো (?) আকাশে দেখা যায়। অবশ্য জিজ্ঞাসা চিহ্নটা আড়াআড়ি-ভাবে, মাথাটা প্রায় পশ্চিম দিকে আর লেজটা পূর্বদিকে রয়েছে। অনেকে এই সাতটি তারাকে লাঙ্গলের মতো দেখায় এরকমও মনে করেন। পৃথিবী ঘোরার জন্যই এই তারাগুলিও সরে সরে যায়। আর 'জিজ্ঞাসা-চিহ্ন'কেও একটু একটু করে ঘুরে যেতে দেখা যায়। আমাদের সাতজন বিখ্যাত ঋষির নামে এই সাতটি তারার নাম দেওয়া হয়েছিল বহুদিন আগে। সেইজন্য এদের সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মাথার উপরের তারা দুটিকে একটা সোজা লাইন বা রেখা টেনে যোগ করে তারপর নিচের দিকে অর্থাৎ দিগন্তের দিকে পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দিলে দেখবে যে, ঐ লাইনটা একটা তারার খুব কাছে এসে গেছে। ঐ তারাকে ধ্রুবনক্ষত্র বলে। আগেই বলেছি সপ্তর্ষিমণ্ডল সরে সরে যায় কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলের মাথার ঐ দুই তারার যে লাইন সেটা কিন্তু সব সময়ই ধ্রুবতারার খুব কাছে থাকে। কাজেই সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখে ধ্রুবতারা দেখা যায় আর ধ্রুবতারা দেখে কোন্‌টা উত্তর দিক্ বোঝা যায়। ফলে অন্য দিক্‌গুলিকেও খুব সহজে বার করা যায়। ধ্রুবতারা কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাদের মতো তত উজ্জ্বল নয়।

ধ্রুবতারা আর লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল

লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলঃ ধ্রুবতারার কাছে আরও ছ'টা তারাকে কাছাকাছি দেখা যায়। এই তারাগুলি ধ্রুবতারার চারপাশে ঘিরে ঘোরে। এদের লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে।

কালপুরুষ ঃ শীতকালে সন্ধ্যাবেলার পর পূর্বদিকের আকাশে লক্ষ্য করলে কতকগুলো বড় আর উজ্জ্বল তারা দেখা যাবে। চৈত্র মাসে এদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আকাশে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলোকে রেখা দিয়ে যোগ করলে এক বিরাট শিকারীর মতো দেখায়। এইবার ছবিটায় নক্ষত্রগুলির নাম দেখ আর সেগুলিকে রেখা দিয়ে যোগ করার ফলে মনে হবে একজন শিকারী যেন এক হাতে ধনুক আর অন্য হাতে তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একে বলে কালপুরুষ। কালপুরুষের কাছে একটা বড় আর খুব উজ্জ্বল তারা দেখা যায়। এর নাম লুব্ধক আর এই তারাটি সব চাইতে বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্র। একে শিকারী কালপুরুষের কুকুর বলা হয়। আর একটা বড় তারা কালপুরুষের ধনুকের উপরের দিক্‌টায় দেখা যায়। এর নাম রোহিণী।

কালপুরুষ
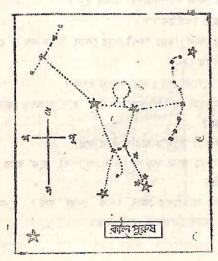
শুকতারা ঃ আসলে এটা একটা গ্রহ, তারা নয়। শুক্র গ্রহের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। শুকতারাই হচ্ছে শুক্রগ্রহ। বছরের কিছু সময় পূর্বদিকের আকাশে খুব উজ্জ্বল এই তারাটিকে দেখা যায়। তখন একে বলা হয় শুকতারা। আবার কিছুদিনের জন্য সন্ধ্যেবেলায়

আকাশে পশ্চিমদিকে দেখা যায় তখন একে বলে সন্ধ্যাতারা। এই শুক্র গ্রহই পৃথিবীর সব থেকে কাছে আছে। চন্দ্র কাছে থাকলেও উপগ্রহ। আকাশের সমস্ত গ্রহ বা নক্ষত্রের মধ্যে শুক্রই সব থেকে উজ্জ্বল। গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলে আকাশে প্রতিদিন তারা নিজেদের জায়গা থেকে সরে সরে যায়। কাজেই এরা এক এক সময় পরস্পরের কাছাকাছি আসে। কিন্তু তারাগুলি ঐ রকম ঘুরে বেড়ায় না। নক্ষত্রদের পরস্পরের দূরত্ব সব সময় একই থাকে।

উত্তর লেখ

১। পৃথিবী যে গোল তা কিভাবে বোঝা যায়?

২। দিন আর রাত কিভাবে হয়?

৩। গাছের ছায়া কোন্ দিকে বেশী আর কোন্ দিকে কম? কেন এরকম হয়?

৪। ছায়াকাঠি দিয়ে দেখ—

(ক) ঠিক দুপুরবেলা কোন্ সময়ে হচ্ছে?

(খ) গ্রীষ্মকালে বা শীতকালে ঠিক দুপুরবেলার ছায়া কিরকম ভাবে পড়ছে?

৫। পৃথিবী কিভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে?

৬। গ্রহ আর নক্ষত্র মধ্যে তফাত কি? পৃথিবী, সূর্য আর শুকতারার মধ্যে তারা কোন্টা?

৭। সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশের কোন্ দিকে দেখা যায়? ধ্রুবনক্ষত্র আকাশের কোন্খানে আছে কিভাবে জানা যায়?

৩

হাতের কাজ

ভূগোলের কয়েকটা বিষয় প্রায়ই আমাদের কাজে লাগে। ঐ সব বিষয় জানা থাকলে নানা কাজে নিজেদের সুবিধে হয়।

দিক্-নির্ণয় : পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণ— এই চারটেই হল প্রধান প্রধান দিক্। অনেক সময় এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় গেলে দিক্ ভুল হয়ে যায়। কি করে ঠিকভাবে দিক্ বার করা যায় এটা নিশ্চয়ই জানা দরকার।

(১) সূর্যের সাহায্যে—সকালে সূর্য ওঠার সময় সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তোমাদের সামনে পড়বে পূর্ব দিক্, আর পেছনে পশ্চিম

সূর্যের সাহায্যে দিক্ ঠিক করা

দিক্। ডান হাত যে দিকে থাকবে সেটা দক্ষিণ আর বাঁ হাতের দিক উত্তর দিক্।

(২) ছায়াকাঠি নিয়ে—আগেই বলা হয়েছে ছায়াকাঠি দিয়ে কিভাবে দিক্ ঠিক করা যায়।

(৩) ধ্রুবতারার সাহায্যে—দিনের বেলায় সূর্য দেখে বা ছায়াকাঠি দেখে দিক্ ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু রাত্তির বেলায় কিভাবে কোন্‌টা

কোন্ দিক বার করবে? তোমরা ধ্রুবতারা বার করতে শিখেছ আর নিশ্চয়ই মনে আছে যে ধ্রুবতারা সব সময় উত্তর দিকে থাকে। উত্তর দিক্ পেয়ে গেলে অন্য দিক্ বার করার কোনো অসুবিধা থাকে না।

(৪) **চুম্বকের সাহায্যে**—তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত জানো যে কোনো চুম্বক যদি ঝুলিয়ে বা কোনো কাঁটার ওপর বসিয়ে রাখা যায়, অবশ্য এমনভাবে যে চুম্বকটা স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে, তা হলে দেখবে যে, চুম্বকের একটা দিক্ সব সময় উত্তর দিকে ফিরে আছে আর অন্য দিক্‌টা দক্ষিণ দিকে। উত্তর, দক্ষিণ জানা গেলে পূর্ব আর পশ্চিমও সহজে জানা যাবে। চুম্বক দিয়ে দিক্ ঠিক করার যে যন্ত্র তৈরী হয় তাকে চুম্বক-কম্পাস বলে।
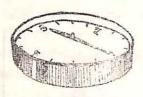
চুম্বক-কম্পাস

প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা একটা ইস্পাতের পাতলা পাতের দুদিক্ সরু করে চুম্বক তৈরী হয়। একটা পেতলের কৌটোর মধ্যে চুম্বকটা একটা খুব সরু-মুখ কাঁটার ওপর এমনভাবে বসান আছে যাতে ওটা সহজেই ঘুরতে পারে। কাঁটার নিচে কৌটোটার তলায় (ভিতরের দিকে) গোল চাকতির ওপর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম দিক্ আঁকা আছে। কৌটোটার ঢাকনা কাঁচের। যন্ত্রটাকে সমান জায়গার উপর, যেমন টেবিলের বা মেঝের উপর রেখে যে দিকেই ঘোরান যাক না কেন চুম্বকটা উত্তর-দক্ষিণে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এই কম্পাস ছোট বা বড় দুরকমই হয়। ছোটগুলি পকেটে করে সহজে নিয়ে যাওয়া যায়। বড়গুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় জাহাজে, যাতে দিক্ ঠিক করে জাহাজ ঠিক জায়গায় যেতে পারে।

প্রধান চারটে দিক্ ঠিক করতে পারলে তাদের মাঝামাঝি দিক্‌গুলিও অতি সহজে বার করা যায়। উত্তর আর পূর্বের মাঝামাঝি দিক্‌কে

উত্তর-পূর্ব দিক্ বলে। ঐ রকম দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম দিক্।

ছবি, নক্শা আর মানচিত্র আঁকা ঃ প্রথমে ছবি আর নক্শার কথা বলা যাক।

বাক্সের ছবি আর নক্শা—মানুষ, জন্তু, ফল, ফুল আর বাড়িঘরের ছবি নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। কিন্তু ছবি দেখে আসল মানুষ, জন্তু বা বাড়ি কতবড় সেটা বোঝা যায় না। তাজমহলের ছবি বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখেছ। ছবিতে তাজমহল খুবই ছোট দেখায়, আসলে কিন্তু অনেক বড়। বাক্সের ছবিটা দেখ। এটা কি ধরনের বাক্স, ছবি দেখে বেশ বোঝা যায়, কিন্তু আকারে কত বড় তা জানা যায় না। এইবার বাক্সের নক্শা বা রেখাচিত্র দেখ। বাক্সটার নক্শা আঁকতে হলে বাক্সকে একটা

বাক্সের ছবি বাক্সের নক্শা
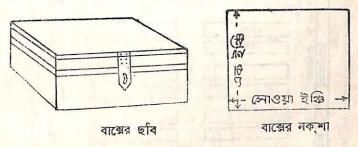
বড় কাগজের উপর রেখে তার চারপাশের সীমানা পেনসিল দিয়ে দাগ দিতে হবে। এইভাবে কাগজের ওপর যে চৌকো ঘর আঁকা হবে সেটা বাক্সের সমান মাপের নক্শা। কিন্তু বড় বড় জিনিস আঁকতে গেলে বা ছোট কাগজের উপর নক্শা আঁকতে গেলে এরকম ভাবে আঁকা যাবে না। তা হলে কিভাবে আঁকা যায়?

ধর বাক্সটা লম্বায় আড়াই ফুট আর চওড়ায় দু'ফুট। যে কাগজের উপর ছবি আঁকবে, ধরে নাও, সেই কাগজটার এক ইঞ্চির সমান বাক্সটার দু'ফুট। তা হলে ঐ কাগজের উপরের নক্শায় বাক্সটার চওড়া হবে ঠিক এক ইঞ্চি। বাক্সটা লম্বায় আড়াই ফুট; এই আড়াই ফুটের দু'ফুট কাগজের উপরের নক্শায় হবে এক ইঞ্চির সমান, আর আড়াই ফুটের

বাকি আধ ফুট হবে সিকি ইঞ্চির সমান। তাহলে লম্বায় বাক্সটা হবে এক ইঞ্চি+সিকি ইঞ্চি বা সওয়া এক ইঞ্চি।

তাহলে কোন্ জিনিস নক্শাতে কতটা ছোট বা কতটা বড় করে আঁকা হবে সেটা জানা দরকার। জিনিসের আসল মাপের সঙ্গে নক্শার মাপের যে সম্বন্ধ তাকে স্কেল বলে। এখানে বাক্সের নক্শার স্কেল হল ২ ফুট=১ ইঞ্চি। এর মানে হল বাক্সের ২ ফুটের সমান নক্শার ১ ইঞ্চি।
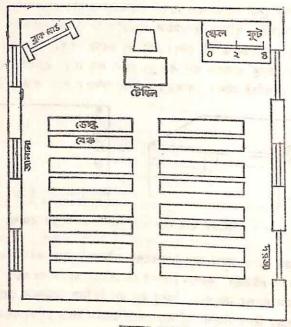
ক্লাসের নক্শা

এইভাবে নক্শা দিয়ে বাক্স বা কোন্ জিনিস কত লম্বা আর চওড়া তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বাক্সটা বা জিনিসটা কত উঁচু সেটা জানা যাচ্ছে না। সেইজন্যে দরকার হলে বাক্সের খাড়া দিকের নক্শাও আঁকতে হয়।

স্কুল, বাড়ি, খেত-খামার, গ্রাম ইত্যাদির নক্শায় ঐ সব জিনিস কতটা

জায়গা জুড়ে আছে সেটা দেখালেই হবে। কোনো স্কুল, বাড়ি বা গাছ কত উঁচু, নক্‌শায় সাধারণত তা দেখান হয় না।

ক্লাসের ছবি ও নক্‌শা—যে ক্লাস ঘরটি দেখান হচ্ছে ধর সেটা লম্বায় ২০ ফুট আর চওড়ায় ১৮ ফুট। নক্‌শায় ১ ইঞ্চিকে চার ফুটের সমান ধরলে ঘরের নক্‌শাটি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আর সাড়ে চার ইঞ্চি চওড়া হবে। ঘরের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ডেস্ক, ব্লাকবোর্ড, দরজা আর জানলা ঐ
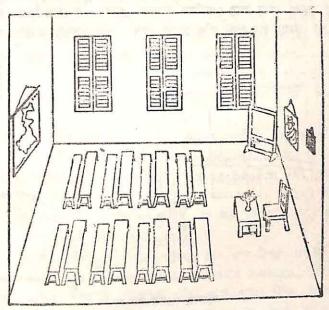
ক্লাসের ছবির খানিকটা অংশ—ঘুরিয়ে দেখান হয়েছে

হিসাবে মাপা যাবে। ক্লাসের নক্‌শা আঁকা যে ছবিটা দেখছ সেটাতে নক্‌শাটা উপরের হিসেব মতো মাপের চাইতেও ছোট করে আঁকা হয়েছে। তার মানে ঐ উপরের স্কেল না নিয়ে অন্য স্কেল নেওয়া হয়েছে। দেখ, এক কোণে স্কেল দেওয়া আছে। এটাতে কতটুকু লম্বা রেখা কয় ফুটের সমান তা বলা আছে।

স্কুলের রাস্তার নক্‌শা—এবার বাড়ি থেকে স্কুলের যাবার যে রাস্তা তার আর তার দুধারের বাগান, বাড়ি, দোকান ইত্যাদির মোটামুটি নক্‌শা কিভাবে আঁকা যায়? বাড়ি থেকে স্কুল দূরে হতে পারে; কাজেই ঐ পথ মাপার জন্য চাই লম্বা ফিতে, আর ফিতে ধরে সাহায্য করার জন্য অন্য আর একজন। অবশ্য মোটামুটি মাপের জন্য ফিতে না হলেও চলে। বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার সময় যত পা ফেলবে সব গুণে রেখ। সঙ্গে অবশ্য খাতা আর পেনসিল রাখতে হবে। কতদূর গিয়ে, মানে কত পা ফেলার পর প্রথম বাঁক পেলে, কোন্ দিকে রাস্তাটা তারপর ঘুরে
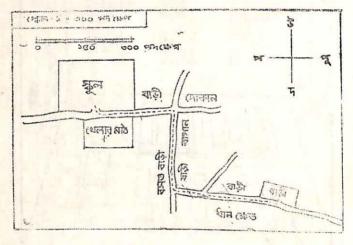
স্কুলের পথের নক্‌শা

গেছে এ সব লিখে রাখতে হবে। দিক্ ঠিক করার জন্য পকেটে রাখার মতো একটা ছোট কম্পাসও থাকা দরকার। এ ছাড়া রাস্তার ডান আর বাঁ দিকে পর পর কি কি বাগান, বাড়ি ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছ আর সেগুলো কত পা যাবার পর পাচ্ছ তাও যদি লিখে রাখতে পার তো খুব ভালো নক্‌শা তৈরী হবে। এবার মনে কর স্কুলে যেতে ৮৪০ বার তোমোকে পা ফেলতে হয়েছে। যদি ৩০০ বার পা ফেলে যতটা রাস্তা যাচ্ছ সেটা নক্‌শায় ১ ইঞ্চি ধরে নাও, তবে সেই মাপে হিসেব করে, রাস্তার বাঁকগুলি

ঠিক করে নিশ্চয়ই নক্‌শা টানতে পারবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে নক্‌শায় বা মানচিত্রে উপরের দিক্‌টা উত্তর, নিচের দিক্‌ দক্ষিণ, ডান দিক্‌ পূর্ব আর বাঁ দিক্‌ পশ্চিম।

মানচিত্র—সব সভ্যদেশেই রাস্তা, ঘাট, গ্রাম, শহর, পাহাড়, নদী ইত্যাদির নক্‌শা খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়। গ্রামের নক্‌শায় নানা রকমের জমি, রাস্তা, খাল, বিল, নদী, বনজঙ্গল ইত্যাদি কোথায় আছে, কত জায়গা জুড়ে আছে দেখান হয়। অনেকগুলি গ্রাম মিলে হয় একটা থানা, আবার কতকগুলি থানা মিলে একটা জেলা হয়। গ্রামের নক্‌শা-গুলি জুড়ে থানার আর থানাগুলির নক্‌শা মিলিয়ে জেলার নক্‌শা তৈরী করা যায়। আমরা যে সব নক্‌শায় বা চিত্রে জেলা, রাজ্য ইত্যাদির মাপ পাই, বা এরা কত বড় বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা কতদূরে ইত্যাদি জানতে পারি তাকে মানচিত্র বলে।

নানা রকমের চিহ্ন দিয়ে মানচিত্রে অনেক রকমের বিষয় দেখান হয়, যেমন কোন্‌গুলি গ্রাম, পোস্ট অফিস, থানা, কোথায় বাজার বা হাট আছে। তাছাড়া নানা রকমের রাস্তা, পাহাড়, খাল, বিল, নদী, এমনকি বরফে ঢাকা জায়গা ইত্যাদি মানচিত্রে দেখান থাকে। বিশেষ বিশেষ মানচিত্রে খনিতে কি কি জিনিস মেলে, চাষ করে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস কোথায় উৎপন্ন হয় তাও দেখান হয়।

সীমারেখা আঁকা—যে মানচিত্র আঁকতে হবে তার উপর একখানা খুব পাতলা সাদা কাগজ বা ট্রেসিং পেপার রেখে প্রথমে মানচিত্রের সীমারেখা আঁকতে হবে। পরে ঐ সীমারেখা আঁকা কাগজখানার উপর লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি সমান দূরে দূরে সোজা রেখা টেনে সমান সমান ছক কাট, যাতে সীমারেখা ঐ ছকগুলির ভিতরেই থাকে। মানচিত্র আঁকার খাতায় ঠিক ঐ রকম ছক হাল্কাভাবে এঁকে, সীমারেখা প্রথম ছবির যে যে ছকের ভিতর দিয়ে গেছে দ্বিতীয় ছবির সেই সেই ছকে ছোট ছোট পূরণ চিহ্ন (×) বা অন্য চিহ্ন দাও। একবার আগেকার ছবির প্রত্যেকটি ছকের ভিতর যেভাবে সীমারেখা রয়েছে, দ্বিতীয় ছবির সেই ছকে সেইভাবে সীমারেখা আঁক। বার বার অভ্যাস করলে ছক ছাড়াই সীমারেখা টানতে পারবে। পাতলা কাগজে বা ট্রেসিং পেপারে যে ছক কাটা হবে, মানচিত্রে

পশ্চিম বঙ্গ
(সীমারেখা)
স্কেল — মাইল
০ ১৬ ৩২ ৪৮ ৬৪

সেই সব ছক অর্ধেক করে কাটলে, মানচিত্রও আকারে অর্ধেক হবে; ফলে স্কেলও বদলে যাবে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা আঁকার জন্য প্রথমে চওড়া দিকে তিন বা ছয় ইঞ্চি রেখা টেনে পরে খাড়ার দিকে এর ডবল অর্থাৎ ছয় বা বার ইঞ্চি রেখা টান। এরপর রেখাগুলিকে সমানভাবে দাগ করে ছক কাট। সীমারেখা টানার সুবিধার জন্য ছবিতে বাঁদিকে তিনটি আর ডানদিকে চারটি কোণাকুনি রেখা টানা হয়েছে। এরপর আগেকার মতো কোনো মানচিত্র দেখে পশ্চিমবাংলার সীমারেখা টানার বিশেষ অসুবিধা হবে না। অভ্যাস করলে খুব তাড়াতাড়ি, বেশ ভালোভাবেই আঁকতে পারবে।

সংগ্রহের কাজ ঃ ভূগোল পড়তে যে সব জিনিস লাগে তার অনেক কিছুই খুব সহজে আশেপাশের জায়গা থেকে যোগাড় করা যায়। গ্রামে, শহরে, নদীর ধারে, মাঠে, হাটে, বাজারে, কারখানায় এসব জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে। ভালোভাবে সংগ্রহ করে, জিনিসগুলিতে নাম, আর কোথা থেকে পাওয়া গেছে লিখে সাজিয়ে রাখলে কিছু দিনের মধ্যেই একটা ছোট সংগ্রহশালা বা যাদুঘর গড়ে উঠবে। যে সব জিনিস সংগ্রহ করে রাখলে বিশেষ কাজে দেবে সেগুলির সম্বন্ধে নিচে লেখা হল ঃ

মাটি ঃ এক এক জায়গার মাটি এক এক রকম হয়। কোনো মাটিতে বালি বেশী, কোনো মাটি এ'টেল, কোনোটা বা লাল, কোনোটা কালচে।

যে মাটিতে বালির ভাগ বেশী, তাকে বেলে মাটি বলে; আর যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী, বালি কম তাকে এ'টেল মাটি বলে। ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি বেলে মাটিতে আর ধান, কলাই ইত্যাদি এ'টেল মাটিতে ভালো হয়।

বাঁচার জন্য গাছের জল আর হাওয়ার দরকার। যে মাটিতে কেবল কাদা, তাতে জল জমে থাকে—হাওয়া চলাচল করে খুবই কম। যে মাটিতে কেবল বালি তাতে জল দাঁড়ায় না বা থাকতে পারে না। কাদা আর বালি যে মাটিতে প্রায় সমান সমান থাকে তাকে দো-আঁশ মাটি বলে। এতে জল আর হাওয়া দুইই থাকতে পারে। এই মাটি সব থেকে ভালো; প্রায় সব ফসলই এতে ভালো হয়।

আশেপাশের মাঠ থেকে যত বিভিন্ন রকমের মাটি পাও তার নমুনা শিশিতে ভরে, শিশির গায়ে কাগজ মেরে লিখে রাখ, কি ধরনের মাটি, কোথা থেকে পেয়েছ।

শিলা ঃ শিলা বা পাথর নানা রকমের হয়, যেমন ঃ

পালল শিলা—পলি সমুদ্রের তলায় থাকে-থাকে জমে পাথর তৈরী হয়। পলি পড়ে তৈরী হয় বলে একে পালল শিলা বলে। বেলে পাথর এই রকমের। তোমরা বোধ হয় জান না যে বেশির ভাগ শিলা আর নোড়া, যা দিয়ে বাটনা বাটা হয়, সেগুলি বেলে পাথরের।

আগ্নেয় শিলা—পৃথিবীর ভিতরের গরমে বেশির ভাগ জিনিসই গলা অবস্থায় পৃথিবীর খুব ভিতরে থাকে। পরে যে কোনো কারণে ঐ সব জিনিস বাইরে বার হয়ে এসে আবার ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যে সব শিলা বা পাথর তৈরী হয়, তাদের বলা হয় আগ্নেয় শিলা। পাকা রাস্তা তৈরি করতে রাস্তার উপর, বা রেল লাইনের দুধারে যে শক্ত, কাল পাথরের কুচি বা টুকরো দেখতে পাবে তাদের বেশির ভাগই এই শিলা। প্রাচীন মূর্তিও কিছু কিছু এই পাথরের তৈরী।

পরিবর্তিত শিলা—এই যে দু রকমের শিলা বা পাথরের কথা বলা হল এরা খুব বেশী গরম আর চাপে পড়ে অনেক দিনে অন্য রকম পাথরে বদলে যায়। মার্বেল, স্লেট ইত্যাদি এই পরিবর্তিত শিলা।

পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেলে এই রকম পাথর নিয়ে এসে, কাগজে নাম আর কোন্ জায়গা থেকে পেয়েছ লিখে স্কুলের সংগ্রহশালায় রেখে দেবে।

শুককীট গুটি মথ

শুককীট আর প্রজাপতি ঃ সকলেই প্রজাপতি দেখেছ। রঙিন পাখা মেলে এরা দিনের বেলায় ফুলে ফুলে উড়ে মধু খায়। প্রজাপতি নানা

রঙের আর নানা আকারের; কোনোটা ছোট, কোনোটা আবার বড়। প্রজাপতি কিভাবে জন্মায় সেটা বেশ মজার। মেয়ে প্রজাপতি গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে শূককীট বা শুঁয়োপোকা বের হয়। তোমরা নিশ্চয়ই আকন্দ, শিউলি, সজনে প্রভৃতি গাছের গায়ে শুঁয়োপোকা আশ্বিন-কার্তিক মাসে দেখে থাকবে। গাছের কচিপাতা খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই পোকাগুলি প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা হয়ে ওঠে। তারপর খাওয়া বন্ধ করে এরা একরকম গুটি তৈরি করে তার ভিতর থাকে। ঐ গুটিগুলিকে গাছের পাতা বা ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। কিছুদিন পরে গুটি কেটে নানা রঙের প্রজাপতি বেরিয়ে আসে।

পরীক্ষা—ঢাকনা-দেওয়া একটা কাঠের বা কার্ড বোর্ডের বাক্সে, উপরে আর পাশে ছোট ছোট ফুটো করে তার মধ্যে কচিপাতা সুদ্ধ গাছের ছোট ছোট ডাল রেখে দাও। তার সঙ্গে সাবধানে কয়েকটা শুঁয়োপোকা ধরে ঐ বাক্সের মধ্যে রাখ। মাঝে মাঝে টাটকা পাতা খেতে দিতে হবে। নিজেরাই দেখতে পাবে কি করে শুঁয়োপোকা থেকে গুটি আর গুটি থেকে প্রজাপতি হয়। যদি প্রজাপতির ডিম পাও তা হলেও হবে।

প্রজাপতি ধরার জাল
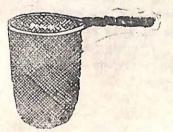
মাছ ধরবার জন্য যে হাতলওলা ছোট জাল থাকে তা দিয়ে বাগান থেকে প্রজাপতি ধরা যায়। ছবিতে যে রকম জাল দেখান হয়েছে সেরকম জাল নিজেরাই তৈরি করতে পার।

মথ—প্রজাপতির মতোই প্রায় দেখতে আর একরকম পতঙ্গ দেখা যায়, কিন্তু এরা প্রজাপতির মতো এত সুন্দর নয়, তাছাড়া এরা রাত্রে উড়ে বেড়ায়। আলো দেখলে আগুনের কাছে আসে। মথেরও প্রজাপতির মতো ডিম, শূককীট, গুটি হয়, তবে মথের শূককীটের গায়ে শুঁয়ো থাকে না। একে রেশম-কীট বা পলু বলে; এরা যে গুটি তৈরি করে তার থেকে রেশম পাওয়া যায়। তুঁত আর কুলগাছের পাতা রেশম কীটের খুব ভালো

খাবার। মথেরা ফুলের উপর পাখা ছড়িয়ে বসে আর প্রজাপতিরা পাখা গুটিয়ে পিঠের উপর তুলে বসে। ফুলের উপর বসার ভঙ্গী দেখে প্রজাপতি আর মথ চেনা যায়।

উত্তর লেখ

১। দিক্ ঠিক করার কি কি উপায় আছে ?
২। স্কুলে যে ঘরে ক্লাস হয় আর বাড়িতে যে ঘরে বসে পড় তাদের নক্শা আঁক।
৩। বাড়ি থেকে তোমার কোনো বন্ধুর বাড়ি যাবার রাস্তার নক্শা আঁক। রাস্তার দুধারে যে সব বসত বাড়ি, বাগান ইত্যাদি আছে সেগুলিও এঁকে দেখাও।
৪। তোমার জেলার মানচিত্রের সীমারেখা আঁক।
৫। বাড়ির বাগান, স্কুলের বাগান, চাষের জমি, নদীর ধারের জমির মাটি পরীক্ষা করে কি ধরনের মাটি দেখতে পাও লিখে রাখ।
৬। শিলা বা পাথর কত রকমের ? তুমি কত রকমের পাথর দেখেছ ?
৭। ডিম থেকে কিভাবে মথ হয় লেখ। শুঁয়োপোকার ছবি আঁক।
৮। তুমি ক'টা প্রজাপতি ধরে স্কুলের সংগ্রহশালায় রেখেছ ? দু-রকমের প্রজাপতির ছবি এঁকে তাতে রং লাগাও।

৪

সমাজের বন্ধু

বেঁচে থাকবার জন্য যে সব জিনিসের খুব দরকার সেগুলি আমরা একা যোগাড় করতে পারি না। অনেকে মিলেমিশে কাজ করলেই এগুলি পাওয়া সম্ভব। এজন্যই আমরা অনেকে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকি, প্রায় একরকমভাবে নিয়ম মেনে চলি। একেই আমরা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা বলি। চাষীরা চাষ করে ধান, গম, ডাল, শাক-সবজি, ফলমূল জন্মায়; তাই আমাদের খাওয়া জোটে। জেলেরা নদী, খাল, বিল বা পুকুর থেকে মাছ ধরে আনে। গোয়ালা—দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি, কলু—তেল আর কুমোর—হাঁড়িকুড়ি যোগান দেয়। ঘরামি, রাজমিস্ত্রী আর মজুর বাড়ি ঘর তৈরি করে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে। এ ছাড়াও আগে আরও কিছু লোকের কথা বলা হয়েছে, গ্রামের লোকেদের সম্বন্ধে বলার সময়। এরা সকলেই নানারকম কাজ করে আমাদের সকলের বা সমাজের উপকার করেছে। এদের সমাজের বন্ধু বলা হয়।

চাষী—চাষীরা কষ্ট করে ধান, গম, ডাল ইত্যাদির চাষ করে বলেই আমরা খেতে পাই। খাবার জিনিস ছাড়া পাট, তুলা ইত্যাদিও চাষীরা চাষ করে। পাট থেকে থলে, চট ইত্যাদি আর তুলা থেকে কাপড় হয়। চাষীরা সকালে গরু আর লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যায়, সারাদিন কাজ করে সেই সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে। এরা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে জমিতে লাঙ্গল দেয়, বীজ বোনে। পাট কাটবার সময় আবার জলে দাঁড়িয়ে বেশির ভাগ সময়ই পাট কাটতে হয়। চাষীরা সমাজের পরম বন্ধু।

জেলে—পুকুর, খাল, বিল আর নদীতে জেলেরা জলে ভিজে, রাত জেগে, ঝড়ের বিপদ্ মাথায় নিয়ে মাছ ধরে। জেলেরা নদী থেকে খুব ছোট ছোট মাছের বাচ্চা বা মাছের পোনা ধরে পুকুরে ছেড়ে দেয়। পোনা বড় হলে জেলেরা ঐ সব মাছ ধরে বিক্রি করে। জলের ধারে ডাঙ্গা থেকে

বা ভেলায় চড়ে, আবার কখনো কখনো নৌকায় চড়ে জেলেরা মাছ ধরে। মাছ খুব ভালো খাদ্য। যারা মাছ যোগায় তারা নিশ্চয়ই সমাজের বন্ধু।
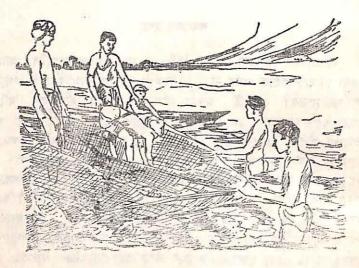
জেলেরা মাছ ধরে এনেছে

সবজি-চাষী—হাটে বা বাজারে গেলে দেখবে কিছু লোক বড় বড় ডালায় করে নানারকম আনাজ, শাক-সবজি, ফলমূল বিক্রি করার জন্য এনেছে। এদের সবজি-চাষী বলা হয়। এরা জমিতে লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, পটোল, আলু, বেগুন, কপি, মুলো, গাজর, মটর-শুঁটি, ঢেঁড়স, নানা রকমের শাক, ফল ইত্যাদি জন্মায়। ভাত আর মাছের মতো এসব জিনিসও আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য খাওয়া দরকার। কাজেই সবজি-চাষীরাও আমাদের বন্ধু।

কারখানার শ্রমিক—কলকারখানায় যারা কাজ করে তাদের কারখানার শ্রমিক বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, হাওড়া আর আশেপাশে কতকগুলি কলকারখানা আছে। এইসব কলকারখানায় কাপড়, চট, থলে, ওষুধ, তেল, আটা, ময়দা, সাবান ইত্যাদি তৈরি হয়। এক একটা বড় কলে হাজার

হাজার শ্রমিক বা মজুর কাজ করে। এই সব মজুর আমাদের দরকারী জিনিস তৈরি করে বলে এরাও সমাজের বন্ধু।

ডাক-পিয়ন—তোমরা সকলেই ডাক-পিয়ন দেখে থাকবে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিদেশে থাকলে তাদের খবর জানবার জন্য সকলেই খুব আগ্রহ করে থাকে। ডাক-পিয়নের কাজ হল বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি

ডাক-পিয়ন

করা। প্রথমে চিঠি ডাকঘরে আসে, সেখান থেকে পিয়নদের চিঠি দেওয়া হয় বিলি করার জন্য। অন্য জায়গা থেকে যদি কেউ কোন জিনিস বা টাকা পাঠায়, সে সব জিনিস ডাক-পিয়নই বাড়িতে দিয়ে যাবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুব দরকারী খবর পাঠাতে হলে টেলিগ্রাফ করে পাঠান হয়। সাইকেল বা মোটর-বাইকে করে ডাক-পিয়ন বাড়িতে বা অফিসে টেলিগ্রাম বিলি করে। এই সব দরকারী কাজ করে বলে পিয়নও সমাজের বন্ধু।

ডাক্তার-কবিরাজ আর মাস্টারমশায়—মানুষকে বাঁচতে হলে প্রথমে চাই খাবার, তারপর পরার কাপড় আর থাকবার জায়গা। এই সব প্রাথমিক জিনিসের ব্যবস্থা কারা করছে তা বলা হয়েছে। খাবার, পরবার আর থাকবার জিনিসের দরকার ছাড়াও লাগে শরীরকে নীরোগ রাখা আর তার সঙ্গে লাগে লেখাপড়া শেখা। ডাক্তার, কবিরাজ বা হেকিম—কিভাবে স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায় তা বলেন আর অসুখ হলে ওষুধ দিয়ে অসুখ সারান। মাস্টারমশাই লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে মানুষের মনকে তৈরি করেন

সত্যিকারের মানুষ হবার জন্যে। সমাজের বন্ধু হিসাবে এঁদের স্থান খুবই উঁচুতে।

এখানে যাঁদের কথা বলা হ'ল তাঁরা ছাড়াও অনেকে নানা কাজ করে সমাজের কোন না কোন উপকার করছেন। এঁরা সকলেই সমাজের বন্ধু।

উত্তর লেখ

১। সমাজ-বন্ধু বলতে কি বোঝ? তুমি বড় হয়ে সমাজের কি কাজ করবে?
২। পুলিস, উকিল, জজ বা বিচারক কি হিসাবে সমাজের বন্ধু? ঝাড়ুদার আর মেথর কি সমাজের বন্ধু?

৫

দেশবিদেশের লোক

আমরা পশ্চিমবঙ্গে থাকি। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের মতো কতকগুলি রাজ্য নিয়ে আমাদের এ দেশ বা ভারত। আমাদের দেশের মতো পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে। নানা দেশে লোকের চেহারা, কাপড়-জামা, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি একই দেশের ভিতরেও পার্থক্য দেখা যায়। নানা জায়গার, নানা দেশের লোকেদের সম্বন্ধে জানতে তোমাদের সকলেরই নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে।

চীনাদের কথা ঃ তোমরা কি জান যে ভারতের উত্তর দিকে বিরাট্ হিমালয় পর্বতের উত্তরে ও পূর্বে চীন বলে মস্তবড় একটা দেশ আছে?

চীনদেশের ছেলেমেয়ে

গ্লোবে বা মানচিত্রে এই দেশটাকে দেখে নিও। এই দেশের লোকেদের বলে চীনা। তোমরা কলকাতায় বা আশেপাশে চীনাদের দেখে থাকবে;

বেশির ভাগ চীনাই কলকাতায় জুতার কারবার করে। এদের অনেকেই চীনদেশ ছেড়ে বহুদিন এখানে বসবাস করছে। এদের গায়ের রঙ সামান্য হলদে; নাক সাধারণত চ্যাপটা আর চোখ ছোট। চীনা পুরুষদের গোঁফ-দাড়ি কম হয়। এরা সাধারণত ভাত, মাছ আর মাংস খায়। চীনারা ভাত খায় দুটো কাঠি দিয়ে। চীন দেশে লোকের সংখ্যা খুব বেশী।

চীনা ভাষায় এক-একটা শব্দ কয়েকটা রেখা টেনে লেখা হয়। চীনা ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকেই তুলি দিয়ে লিখতে শেখে। পরে দরকার মতো পেন্‌সিল, কলম ব্যবহার করে। চীনারা ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসে। এদের ঘুড়িও হয় নানারকমের, যেমন মাছ-ঘুড়ি, পাখি-ঘুড়ি, লন্ঠন-ঘুড়ি ইত্যাদি। চীনারা নানারকমের খেলনা তৈরি করতে জানে। আমরা যেমন পা ছুঁয়ে বা হাত তুলে প্রণাম বা নমস্কার করি চীনারা মাথা নুইয়ে নমস্কার জানায়। চীনারা নানারকমের উৎসব পালন করে।

জাপানীদের কথা ঃ চীনদেশের পূর্বদিকে ছোট এক সমুদ্র পেরিয়ে আর একটা দেশে যাওয়া যায়। এই দেশকে জাপান বলে। এখানকার লোকেরা ছোটখাটো, গায়ের রঙ ফরসা আর সামান্য হলদে, চোখ ছোট। মেয়েরা যে সুন্দর পোশাক পরে তাকে কিমোনো বলে। জাপানের ঘর-বাড়ি খুব সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লোকেরা খুবই ভদ্র। জাপানে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই বাগানে ফুলগাছ আছে। ফুলদানিতে কি ভাবে সুন্দর করে ফুল সাজান যায় তা ছেলেমেয়েদের শেখান হয়। জাপানের চেরি ফুল খুব সুন্দর। চীনাদের মতো জাপানের ছেলেমেয়েরাও ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসে। এরাও নানারকমের খেলনা তৈরি করে।

প্রতি বছর ৩রা মার্চ মেয়েদের পুতুল-উৎসব হয়। তখন খুব সুন্দর সুন্দর পুতুল দিয়ে বহু দিন আগেকার সম্রাট্‌দের দরবার সাজান হয়। এই সব খেলাঘরের দরবারে সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী, পাত্র-মিত্র প্রভৃতির মূর্তি সাজান হয়। জাপানের পুতুল দেখতে খুব ভালো আর খুবই দামী। দামী দামী পুতুল মেয়েরা মায়েদের কাছ থেকে উপহার পায়।

প্রতি বছর ৫ই মে জাপানে ছেলেমেয়েদের এক বিশেষ উৎসব হয়। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা

মানুষের মতো মানুষ হয়। দেশের বড় বড় বীরদের মূর্তি এই উৎসবে সাজান হয় আর ঐ সঙ্গে ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্রও দেখান হয়। কার্প ঐ দেশের খুব জোরাল সাহসী মাছ। সেদিন কাগজ বা কাপড় দিয়ে প্রকান্ড

জাপানের ছেলেমেয়ে

প্রকান্ড কার্প মাছ তৈরি করে বাড়ির উপর উঁচু খুঁটি থেকে ওড়ান হয়। ঐ মাছ যেমন হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে উড়তে থাকে, ছেলেমেয়েরাও যেন জীবনে ঐভাবে যুদ্ধ করে চলতে পারে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়।

জাপানে আগে অনেক বাড়ি কাঠের ছিল, এখন পাকা বাড়িই বেশী; তার মধ্যে অনেক তলা বাড়ি বেশী। চীনাদের মতো জাপানীরাও সাধারণত

ভাত, মাছ আর মাংস খায় তারা নমস্কার করে মাথা আর শরীরের উপরের দিক্‌টা নুইয়ে।

এস্কিমোদের কথাঃ পৃথিবীর উত্তর দিকে গ্রীনল্যান্ড নামে একটা দেশ আছে; এটি একটা বিরাট্ দ্বীপ, আর সেখানে প্রচণ্ড শীত। এত ঠাণ্ডা জায়গা আরও আছে উত্তর আমেরিকার একেবারে উত্তরে আলাস্কা অঞ্চলে। ঐ সব ভয়ানক ঠাণ্ডা জায়গায় সমুদ্রের ধারে এস্কিমোরা থাকে। এদের প্রায় অর্ধেকই থাকে গ্রীনল্যান্ডে। দেশের নাম গ্রীনল্যান্ড মানে

এস্কিমো শিকারে বের হয়েছে

সবুজ দেশ হলেও বছরের প্রায় নয় মাস সারা দেশটা বরফে ঢাকা থাকে। সেই জন্য গাছপালা প্রায় জন্মাতে পারে না আর চাষ-আবাদও নেই। বছরের বাকী তিন মাস বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল। অবশ্য মনে করো না যে বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল আমাদের দেশের মতো। ওদের গ্রীষ্মকাল আমাদের শীতকালের মতো বা তার চাইতেও বেশী ঠাণ্ডা। এই তিন মাসে বরফ

গলতে থাকে। শেওলা আর ছোট ছোট গাছপালা জন্মায় আর বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। এখানকার দক্ষিণ দিকে গরমের সময়ে দিন খুব বড়, রাত্রি দশটা-এগারটার সময়ও দিন আবার শীতকালে রাত্রি খুব বড়, বেলা দুটো-তিনটে কি তার আগে সন্ধ্যা হতে শুরু হবে আর সকাল ন'টা দশটার সময় ভোর হবে।

এখানকার লোকেরা শীতকালে বরফ দিয়ে ঘর তৈরি করে তাতে বাস করে। একটা বিরাট বরফের গামলা উল্টো করে রাখলে যেমন দেখায়, এস্কিমোদের বরফের ঘর দেখতে অনেকটা সেই রকম। এই ঘরে একটা মাত্র খুব নিচু ঢোকবার পথ থাকে। এই ঘরকে বলে "ইগ্‌লু"।

ইগ্‌লু

গরমের সময় যখন বরফ গলতে থাকে তখন এস্কিমোরা চামড়ার তৈরি তাঁবুতে বাস করে। শীতের নয় মাস খাবার পাওয়া যায় না, কাজেই গরমের সময় এস্কিমোরা জীবজন্তু শিকারে খুব ব্যস্ত থাকে। আগে এস্কিমোরা কাঁচা মাংস খেত যার জন্যে এদের নাম হয়েছে এস্কিমো। এখন এরা সভ্য লোকেদের সংস্পর্শে আসায় এদের চালচলন অনেক বদলে গেছে। এখনও অনেক এস্কিমো সমুদ্রের মাছ, সাদা ভাল্লুক, বল্‌গা হরিণ, তিমি, সীল ইত্যাদি শিকার করে ও তাদের মাংস খায়। এরা লম্বা দড়ি লাগানো একরকম বল্লম দিয়ে এই সব শিকার করে। এই ধরনের বল্লমের নাম

হারপুন। তীর-ধনুক দিয়ে বল্‌গা হরিণ, ভাল্লুক ইত্যাদি শিকার করে। শিকার-করা জীব-জন্তুর চামড়া দিয়ে নিজেদের পোশাক, তাঁবু ইত্যাদি তৈরি করে। সীলের চর্বি পুড়িয়ে আলো জ্বালে বা ঘর গরম করে।

স্লেজ গাড়ি

এস্কিমোদের একরকম মজার গাড়ি আছে। একে স্লেজ গাড়ি বলে। ঐ গাড়িতে চাকা থাকে না। শীতকালে কুকুরে ঐ গাড়ি বরফের ওপর দিয়ে

কায়াক

টেনে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলে যায় এস্কিমোরা তখন এক-রকম ছোট নৌকায় চড়ে শিকার করতে বের হয়। সমুদ্রের জলে যে সব

কাঠ ভেসে আসে সেই সব কাঠ যোগাড় করে আর চামড়া দিয়ে ঢেকে এই নৌকা তৈরি হয়। এই নৌকাকে বলে "কায়াক"।

পিগ্‌মিদের কথা ঃ আফ্রিকা বলে এক বিরাট্ মহাদেশ ভারতের পশ্চিম দিকের সমুদ্রের ওধারে অবস্থিত। এই দেশের মধ্যভাগ খুব গরম আর সেখানে বৃষ্টি হয় খুব বেশী। খুব গভীর ও বিস্তৃত বন-জঙ্গল এ অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই জঙ্গলের ভেতর লম্বায় পাঁচ ফুটেরও কম, তামাটে রংয়ের এক জাতের লোক দেখা যায় এদের নাক চ্যাপটা, চুল ছোট আর কোঁক্‌ড়ান। খুব ছোট বলেই এদের পিগ্‌মি বা বামন বলা হয়। এরা গাছের ডাল বাঁকিয়ে মাটিতে পুঁতে, তার ওপর পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি করে। বনের ফলমূল

পিগ্‌মি আর তাদের ঘর

কুড়িয়ে, মাছ ধরে বা পশু-পাখি শিকার করে এরা খায়। এরা চাষবাস বা গরু-মোষ পুষতে জানে না। পিগ্‌মিরা গাছে চড়তে খুব ওস্তাদ। গরমের দেশ বলে এদের কাপড়-চোপড়ের বিশেষ দরকার হয় না, আর কাপড় তৈরি করতেও জানে না। গাছের লতাপাতা আর ছাল কোমরে জড়িয়ে রাখে।

রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা ঃ এরা উত্তর আমেরিকার লোক। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে কলম্বস নামে একজন ইউরোপের লোক ভারতে আসবার জন্যে জাহাজে রওনা হন। তিনি আমেরিকার কাছে এক জায়গায় গিয়ে মনে করলেন সেটাই ভারতবর্ষ। কাজেই ওখানকার লোকেদের ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয় বলা হয়।

রেড ইন্ডিয়ান দলপতি

নূতন দেশ আমেরিকা আবিষ্কার হবার পর ইউরোপের নানা জাতির সুসভ্য মানুষ সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। এঁদের সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা আরও ভালো হয়েছে। এদের চেহারা কি রকম জান? চুল খাড়া আর কালো, দাড়ি গোঁফ খুবই কম, চোখ ছোট, নাক উঁচু। গায়ের রঙ হালকা বাদামী বা তামাটে বলে এদের রেড ইন্ডিয়ান নাম হয়েছে। এদের অনেকে আমেরিকায় উত্তর দিকের যে জঙ্গল আছে সেখানে থাকে। সাধারণত হ্রদের বা নদীর ধারে

তাঁবু ফেলে এরা বাস করে। হ্রদে বা নদীতে মাছ ধরে, তীর ধনুক দিয়ে, ফাঁদ পেতে জন্তু জানোয়ার শিকার করে। এসব জন্তুর পশমের বদলে তারা অন্য লোকদের কাছ থেকে ভালো খাবার, কাপড়, বন্দুক ইত্যাদি যোগাড় করে। এক জায়গার শিকার কমে গেলে অন্য জায়গায় যেতে হয় বলে এদের তাঁবুতে বাস করাই সুবিধাজনক। এরা চুলের মধ্যে পাখির পালক গুঁজে রাখে; উৎসবের সময় রঙিন পোশাক আর পাখির পালকের টুপি পরে। এদের সর্দারের জামাকাপড় খুব জমকালো। এরা খুব সাহসী, আর ভালো যোদ্ধা। এদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর, তাছাড়া এরা ঘোড়ায় চড়তে খুব নিপুণ। অল্প বয়স থেকেই এদের ছেলেদের ঘোড়ায় চড়া আর শিকার করা শেখান হয়।

বেদুইনদের কথাঃ এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশের মাঝামাঝি জায়গায় আরব দেশ। এই দেশের বেশির ভাগই মরুভূমি; বৃষ্টি প্রায় হয় না। যেখানে নদী বা মাটির নিচে জল আছে সেখানে গাছপালা আর শস্য হয়। মরুভূমির মধ্যে যে-যে জায়গায় ঐরকম গাছপালা দেখা যায় ও জল পাওয়া যায়, তাদের মরুদ্যান বা মরুভূমির বাগান বলে। মরুদ্যানগুলির আয়তন কিন্তু খুব বড় হয় না, কাজেই লোকজন যে বরাবর মরুদ্যানে স্থায়িভাবে থাকবে তা সম্ভব নয়। অবশ্য কিছু কিছু বড় মরুদ্যান আছে সেখানে কিছু কিছু লোকজন স্থায়িভাবে থাকে। বেশির ভাগ লোকই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়, এক মরুদ্যান থেকে অন্য মরুদ্যানে। কিছু কিছু জায়গায় ঘাস পাওয়া যায় কিন্তু সে সব জায়গায় চাষবাস সম্ভব নয়। যারা মরুভূমিতে এইরকম ঘুরে ঘুরে জীবন কাটায় সেই সব আরবদের বেদুইন বলে। সব সময়ই ঘুরে ঘুরে কাটায় বলে এদের যাযাবর বলা হয়।

বেদুইনদের প্রধান কাজ হল উট, ভেড়া বা ছাগল পোষা। মরুভূমিতে চলাফেরার জন্য উটই প্রধান বাহন। উট মরুভূমিতে জল ছাড়া বেশ কিছু দিন চলতে পারে। এ ছাড়া উটের দুধ আর মাংস বেদুইনদের খাদ্য। উট বিক্রি করেও এরা ভালো রোজগার করে। উটের লোম দিয়ে পোশাক, তাঁবুর কাপড় তৈরি হয়। চলাফেরা করার জন্য তারা ঘোড়া পোষে। বেদুইন ছেলেরা অল্প বয়সেই ঘোড়ায় চড়তে শেখে। উট ছাড়া ছাগল

আর ভেড়ার দুধ আর মাংস তাদের খাদ্য, আর এদের লোমও উটের লোমের মতো পোশাক, তাঁবুর কাপড়, গালচে, কম্বল ইত্যাদি তৈরি করতে লাগায়। প্রত্যেক বেদুইন দলের একজন সর্দার থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে

আরব বেদুইন

ঘাসের জমি, পানীয় জল ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া, মারামারি লেগেই আছে। দুধ ও মাংস ছাড়া খেজুর এদের একটা প্রধান খাদ্য। মরূদ্যানে খুব ভালো খেজুর জন্মায়। মরুভূমির অসহ্য গরম থেকে বাঁচবার জন্য বেদুইনরা মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে লম্বা একরকম ঢিলে পোশাক পরে।

উত্তর লেখ

১। দেশ বিদেশের লোকের মধ্যে কারা বেশ সভ্য আর উন্নত, আর কারা বন্য, এখনও অনুন্নত?

২। চীনা আর জাপানী ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। এস্কিমোরা শীত আর গরমকাল কিভাবে কাটায় ?

৪। পিগ্‌মিদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। রেড ইন্ডিয়ানরা কিভাবে জীবন কাটায় লেখ।

৬। আরব বেদুইনদের যাযাবর বলা হয় কেন ?

৭। এস্কিমোদের বাড়ি আর পিগ্‌মিদের ঘর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

প্রকৃতি-পরিচয়

বিজ্ঞান

(তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য)

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

বিজ্ঞান

গোড়ার কথা

পৃথিবীর নানা জায়গায় কত রকমের গাছপালা, জীবজন্তু, কত পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর রয়েছে। ওপরে রয়েছে আকাশ আর ভেতরে রয়েছে প্রায় গলা-অবস্থায় পাথর ইত্যাদি। এসব কিছুরই প্রায় সব সময়ই নানারকম অদল-বদল বা পরিবর্তন হচ্ছে। কিছু আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাই আবার কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে অনেক-দিন ধরে লক্ষ্য করার পর। এই সব কিছু নিয়েই হল "প্রকৃতি"। কেবল বই পড়ে প্রকৃতিকে জানা যায় না। ঠিকভাবে জানতে হলে এর অনবরত যে অদল-বদল হচ্ছে সেগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে আর যেগুলো সম্ভব হাতে-কলমে দেখতে হবে। আশে-পাশে প্রকৃতি-পরিচয়ের জন্য সপ্তাহে কম করে একদিনও মাস্টার মশায়ের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় ঘুরবে। এক এক ঋতুতে এক এক রকম বিষয় দেখার সুবিধে। বর্ষাকালে খানা বা ডোবায় ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়; শামুকও ঐ সময় বেশী দেখা যায়। ওদের বিষয় জানতে হলে বর্ষার সময়ই ভালো। বসন্তকালে নানারকম ফুল ফোটে, মৌমাছি আর প্রজাপতিদেরও বেশী দেখা যায়। কাজেই ওদের বিষয় জানতে বসন্তকাল অপেক্ষাকৃত ভালো। অবশ্য অন্য ঋতুতেও এসব পাওয়া যায় আর এদের সম্বন্ধে শেখা যায়।

প্রকৃতিকে জানবার জন্য সবজি আর ফুলের বাগানের দরকার। স্কুলের জমিকে ছোট ছোট ভাগ করে কয়েকজনকে এক একটা ছোট ভাগে গাছপালা জন্মাবার ভার দেওয়া হলে ঐ কাজের ভেতর দিয়ে গাছপালা সম্বন্ধে অনেক কিছু তারা জানতে পারবে; আর যেসব পোকামাকড় গাছেদের ফুলের বা ফলের বন্ধু বা শত্রু তাদেরও ঐ সঙ্গে জানা হবে। শহরের স্কুলে বা বাড়িতে বাগান করায় জায়গা না থাকলে টবে, বা অন্য কোনো জায়গায়

মাটিতে এমনকি খুরি বা সরাতেও ছোট ছোট গাছপালা জন্মান যায়। মাছ, পাখি বা অন্য জন্তু জানোয়ার পুষেও তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।। সব সময়ই খেয়াল রেখে যা যা দেখলে সে সব খাতায় লিখে রাখতে হবে। গাছপালা, লতাপাতা, ফুল, ফল বা জন্তু জানোয়ারের ছবি এঁকে তাদের যেখানে যেমন রঙ দেখেছ সেই রকম এঁকে রাখতে হবে। এইভাবে যদি ঠিক মতো লেখ আর এঁকে যাও তো দেখবে নিজেদের এক একটা সুন্দর প্রকৃতি-পরিচয়ের বই তৈরি হয়েছে।

গাছগাছড়ার কথা

বাগানে বা বাড়ির আশেপাশে কত রকমের গাছ, লতা, মস ইত্যাদি দেখা যায়। এক কথায় এদের গাছগাছড়া বা উদ্ভিদ্ বলে। আমাদের দেহে যেমন মাথা, হাত, পা, বুক, পেট ইত্যাদি আছে এদেরও কি সেই-রকম আছে ?

গাছের নানা অংশঃ একটা যে কোনো চারাগাছ, ধর বেগুনের চারা, মাটি থেকে তুলে দেখ। দেখবে মাটির নিচে চারাটার খানিকটা অংশ ছিল, এটাকে বলা হয় **মূল** বা **শেকড়**। মাটির ওপরে যে মোটা অংশটা সেটা কাণ্ড, আর কাণ্ড থেকে সরু সরু শাখাগুলোকে বলে **ডালপালা** ; এগুলোও কাণ্ডের অংশ। কাণ্ড আর ডালপালা থেকে **সবুজ পাতা** বের হয়। পাতার মাঝখানে থেকে **ফুল**, আর সেই **ফুল** থেকে হয় ফল।

বেগুনের মধ্যে, বিশেষ করে পাকা বেগুনের মধ্যে **বীজ** বা বিচি তোমরা দেখে থাকবে। ফুল, ফল বা বীজ না হলেও গাছ বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু মূল গেলে গাছ বাঁচে না। পাতা বা কাণ্ড গেলেও অনেক সময় গাছ মরে যায়।

শেওলা, মস্ আর ফার্ন ঃ পুকুরের জলে সুতোর মতো সবুজ রঙের শেওলা হয়তো অনেকেই দেখেছ। তোমরা জান কি যে শেওলার ফুল, ফল তো হয়ই না, মূল, কাণ্ড, পাতা বলেও আলাদা কিছু নেই। সেই-জন্য একে খুব নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ বলা হয়।

পুকুর ঘাটে, ভিজে দেওয়ালে, পুরোনো কুয়োর ভেতরের গায়ে সবুজ একরকম উদ্ভিদ্ দেখা যায়। আমরা সাধারণত একেও শেওলা বলি; কিন্তু আসলে এরা শেওলা থেকে ভিন্ন একটু উঁচু জাতের উদ্ভিদ্, নাম মস্। শেওলার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একই রকম, কিন্তু মসের

কাণ্ড আর পাতা স্পষ্ট বোঝা যায়। এর যে অংশ শেকড়ের মতো গাছটাকে নিচের দিকে আটকে রাখে সেটা কিন্তু শেকড় নয়। মসেরও ফুল বা ফল হয় না। মস্ বড় হলে বা পুষ্ট হলে তার মাথা থেকে সরু শিষ বের হয়। ঐ শিষের আগায় থলির মধ্যে রেণু থাকে, থলি ফেটে রেণু চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ে; তার থেকেই নতুন মসের জন্ম হয়।

বেগুন গাছ

মসের চেয়ে আর একটু উঁচু জাতের উদ্ভিদ্ হল ফার্ন। এদেরও ফুল বা ফল হয় না পাতাগুলো ভারী সুন্দর দেখতে বলে অনেকে

শেওলা
মস্
ফার্ন

টবে এই গাছ জন্মিয়ে বাড়িতে সাজিয়ে রাখে। ফার্ন ঠাণ্ডা আর ভিজে জায়গায় ভালো হয়। এইরকম গাছ কাণ্ড, পাতা আর শেকড় আছে। এদের পাতার নিচে খুব ছোট ছোট গুটির মতো জিনিস থাকে ; তার মধ্যে রেণু হয়। এই রেণু মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আবার নতুন ফার্নের জন্ম দেয়।

বীজ থেকে চারাগাছের জন্মঃ বর্ষার সময় বাগানে বা বাড়ির আশে-পাশে নানা রকমের গাছগাছড়া আপনা থেকে জন্মায়। এর কারণ কি? যে-সমস্ত বীজ আগে মাটিতে আপনা থেকে পড়েছিল বা পাখিতে এনে ফেলেছিল, বর্ষার জল পেয়ে সেগুলো থেকে চারাগাছ আপনা-আপনি বেরিয়েছে। আচ্ছা—শুধু জল হলেই হবে, না অন্য আর কিছু দরকার আছে? দেখা যাক পরীক্ষা করে।

চারা জন্মাবার জন্য জল আর হাওয়ার দরকার

প্রথম পরীক্ষা ঃ একটা কাঁচের গ্লাসের প্রায় অর্ধেক জলে ভর্তি করে একটা পাতলা, সরু কাঠের টুকরো বা কাঠির সঙ্গে তিনটি ছোলা ছবিতে

যে রকম দেখান হয়েছে, ঐভাবে এ'টে ঐ গ্লাসের ভেতর রাখতে হবে। প্রথম ছোলা যেন জলের বাইরে থাকে, দ্বিতীয়টার কিছু অংশ জলে ডুবে থাকবে এবং তৃতীয়টা একেবারে জলের ভেতর থাকবে। কিছুদিন বাদে দেখবে দ্বিতীয় ছোলাটা থেকে মূল আর কান্ড বেরিয়ে আসছে, কিন্তু প্রথম আর তৃতীয় ছোলা থেকে কিছুই বের হয়নি। এর কারণ হল প্রথম ছোলা জল পায়নি আর তৃতীয় ছোলা পুরো জলে ডুবে থাকার জন্য বাতাস পায়নি। দ্বিতীয়টা জল আর বাতাস দুই-ই পেয়েছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বীজ থেকে চারা গজাবার জন্য জল আর বাতাস ছাড়া তাপেরও দরকার। এস্কিমোদের দেশে গাছপালা খুব কম জন্মায়, সেখানে খুব বেশী ঠান্ডা আর বরফ থাকে বলে। তাহলে কি মরুভূমির ভেতর খুব ভালোভাবে গাছ জন্মাবে? তা নয়। মরুভূমিতে গরম এত বেশী যে সাধারণ গাছ বাঁচতে পারে না। পরিমিত তাপ চাই চারাগাছ জন্মানর জন্য

এবারে বীজ থেকে কিভাবে চারাগাছ জন্মায় সেটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—কয়েকটা মটর দানা একটা বাটিতে একদিন ভিজিয়ে রাখ। ভেজানো মটরের ওপরের সাদা খোসাটা ছাড়িয়ে ফেললে ভেতরের একটা গোলমতো হলদে জিনিস থাকবে। এটাকে বলতে পার শিশু-উদ্ভিদ্। এই গোল জিনিসটাকে চাপ দিলে দেখবে সেটা দুভাগ হয়ে গেছে। চারাগাছ যেটা হবে তার খাবার পাবে এই গোল দুটো ভাগ থেকেই। গোল দু-ভাগের ভেতর একটা ছোট, সরু আর বাঁকা মতো জিনিস দেখতে পাবে। এই জিনিসটার যে দিক্‌টা সরু আর লম্বা সেটা হল **ভাবী-মূল**; অপর দিকের বাঁকা আর চ্যাপটা অংশ হল **ভাবী-কান্ড**।

তৃতীয় পরীক্ষা—একটা কাঁচের গ্লাসে ভিজে তুলো বা কাঠের গুঁড়ো রেখে তার ভেতর কয়েকটা ছোলা বা মটর দানার বীজ পুঁতে দিলে দিন দুই পরে দেখা যাবে, শিশু-উদ্ভিদের মূলটা বের হয়ে নিচের দিকে

যাচ্ছে। আরও দু-একদিন পরে কাণ্ডটা বের হয়ে ওপরের দিকে যাবে। একেই আমরা বলি অঙ্কুর গজানো। খানিকটা লম্বা হওয়ার পর মূলের গা থেকে সরু সরু শাখামূল বা শেকড় বের হবে। অন্যদিকে কাণ্ডটাও
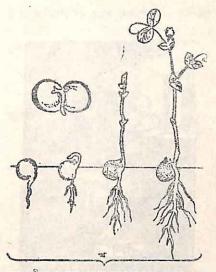
মটরদানার বীজ থেকে চারা জন্মাবার নানা অবস্থা

লম্বা হবে আর তার গা থেকে সবুজ পাতা গজাবে। তুলো বা কাঠের গুঁড়োতে গাছের খাবার নেই; কাজেই বীজের মধ্যে জমান খাবারেই চারাগাছের কিছুদিন চলে। আরও বাড়াতে হলে চারাগাছকে মাটিতে বসাতে হবে যাতে মাটি থেকে খাবার পায়। তুলো বা কাঠের গুঁড়োতেও চারাগাছের খাবার অন্যভাবে দেওয়া যায়।

অঙ্কুর গজাবার জন্য জল, তাপ বা গরম আর বাতাসের দরকার; যেভাবেই বীজ বসাও না কেন, শিশু-উদ্ভিদের মূল আলো যে দিক্ থেকে আসছে তার উল্টোদিকে কাঠের গুঁড়ো, তুলো বা মাটির মধ্যে ঢুকবে।

চতুর্থ পরীক্ষা—অঙ্কুর গজাবার পরে গাছ বাড়বার জন্য আলোর বিশেষ দরকার। আলোতেই গাছের সবুজ পাতা আর কাণ্ড ভালোভাবে বাড়ে। আলো না থাকলে গাছ সাদা হয়ে মরে যায়। কোনো জায়গার ঘাস—একটা ইট, তক্তা বা টিন দিয়ে কিছুদিন ঢেকে রাখলে সে ঘাস সাদা হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে জানালার ধারে যেখানে সূর্যের আলো আছে,
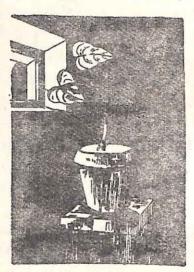
গাছ কিভাবে আলো চায়

সেখানে একটা টবসমেত চারাগাছ রাখ। ঘরের অন্য জানলা আর দরজা বন্ধ রাখ যাতে অন্যদিক্ থেকে সূর্যের আলো না আসে। কিছুদিন পরে দেখবে যে গাছটার ডালপালা আর পাতাগুলো আলো পাবার জন্য জানালার দিকে বেঁকে গেছে।

লতাঃ আম, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছের কাণ্ড শক্ত; সেজন্য এরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। লাউ, কুমড়ো, শসা, শিম, অপরাজিতা বা ঐ ধরনের গাছের কাণ্ডের জোর কম। **কাজেই** এই সব গাছ মাটির

ওপর লতিয়ে চলে বা কোনো জিনিস পেলে তাকে ভর করে বা জড়িয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে। এই ধরনের গাছকে লতা বলে। এরা সাধারণত দুভাবে ওপরে ওঠে। লাউ, কুমড়ো, শসা, ঝিঙে, মটর প্রভৃতি লতার শাখা থেকে স্প্রীং-এর মতো সরু লম্বা অংশ বের হয়; এগুলোকে বলা হয় আকর্ষ। এরা যেন লতার হাতের আঙুল। আকর্ষ দিয়ে লতা কাছাকাছি ডালপালা, খুঁটি, গাছ যা পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে ওঠবার চেষ্টা

অপরাজিতা কুমড়ো

করে। সিম আর অপরাজিতার আকর্ষ নেই। এইজন্যে এরা নিজেদের লতানো কাণ্ড দিয়ে খুঁটি বা গাছ জড়িয়ে ওপরে ওঠে।

পাতা: গাছের কাণ্ড থেকে পাতা বের হয়, পাতা দেখে কোন্‌টা কি গাছ তা সাধারণত চেনা যায়। পাতার দুটো অংশ—বোঁটা আর ফলক। বোঁটার ওপরের চওড়া সবুজ অংশটার নাম ফলক, সাধারণত আমরা একেই পাতা বলি। বেশির ভাগ পাতারই—যেমন আম, জবা, অশ্বত্থ প্রভৃতির বোঁটা আর ফলক দুই-ই আছে। আনারসের পাতার কিন্তু কেবলমাত্র ফলক আছে, বোঁটা নেই। নানা চেহারার বা আকারের পাতা দেখা যায়। পদ্ম বা শালুকের পাতা গোলমতো; বাঁশ বা আনারসের

পাতা বল্লমের ফলার মতো; পানের পাতা, অশ্বত্থের পাতা অনেকটা হরতনের মতো।

আম, কাঁঠাল প্রভৃতির পাতার কিনারা বেশ সমান; গোলাপ, জবা, নিম ইত্যাদি পাতার কিনারা খাঁজকাটা। দেবদারু পাতার কিনারা ঢেউ-খেলানো। অনেক পাতারই একটা বোঁটাতে ফলক; কিন্তু এমন অনেক পাতা আছে যাদের বোঁটাতে একের বেশী ফলক থাকে—যেমন তেঁতুল, শিমুল ইত্যাদি।
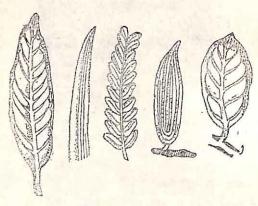
আম আনারস তেঁতুল বাঁশ কাঁঠাল

॥ পাতা ॥

কতকগুলো গাছের পাতা বেশ পুরু, আবার কতকগুলো গাছের পাতা পাতলা। আকন্দ, মনসা, পাথরকুচি প্রভৃতির পাতা পুরু; লাউ, কুমড়ো, কপি প্রভৃতির পাতা অত পুরু নয়; বাঁশ, অশ্বত্থ, ধানের পাতা পাতলা।

কোনো পাতা খুব মসৃণ, কোনোটা আবার খুব খসখসে। কচু, পদ্ম, শালুক প্রভৃতির পাতা এত মসৃণ যে তাতে জলের দাগ লাগে না। ডুমুর, বাঁশ, কুমড়ো প্রভৃতির পাতা বেশ খসখসে।

বেল শিমুল অশ্বত্থ

ফুল : সারা বছর এক এক সময়ে এক এক রকম ফুল ফুটতে দেখা যায়। একটা জবাফুল গাছ থেকে তুলে ভালো করে দেখ। দেখবে বোঁটার ওপর সবুজ রঙের গ্লাসের মতো একটা ঢাকা রয়েছে। একে বলে **বৃতি**। এই বৃতির ধারে পাঁচটা দাঁতের মতো খাঁজ আছে। বৃতির ভেতর থেকে পাঁচটা খুব উজ্জ্বল লাল পাপড়ি বের হয়ে ছড়িয়ে আছে। পাপড়ির জন্যেই ফুল সুন্দর দেখায়। পাপড়ির ভেতর থেকে একটা লম্বা নলের মতো জিনিস বাইরে গেছে। একে বলে **কেশর**। কুঁড়ি অবস্থায় বৃতিই কচি আর নরম পাপড়ি আর কেশরকে ঢেকে রেখে বাঁচায়।

মটর ফুল দেখতে কতকটা প্রজাপতির মতো। সাদা, লাল, নীল ইত্যাদি নানা রঙের মটর ফুল দেখা যায়। এরও গোড়ায় সবুজ রঙের বৃতি আছে। পাপড়িও পাঁচটা কিন্তু পাপড়িগুলো সমান নয়। সবচেয়ে

বড় পাপড়ির কোলেই রয়েছে একজোড়া ছোট পাপড়ি, অনেকটা পাখির ডানার মতো। ভেতরে আরও ছোট এক জোড়া পাপড়ি মিলে ডোঙার মতো হয়েছে।

১। জবা ২। মটর ৩। রজনীগন্ধা

রজনীগন্ধা ফুলে সাধারণত ছ'টা পাপড়ি দেখা যায়।

ফল আর বীজ ঃ গাছপালা আর তাদের ফুল যেমন নানারকমের তেমনি

তাদের ফলও নানারকমের হয়ে থাকে। কোনো কোনো ফল আমরা খাই।

ফল সাধারণত দুরকমের—**সরস** বা **রসাল ফল** আর **নীরস** বা **শুকনো ফল**। আম, জাম, কাঁঠাল, তরমুজ, পেঁপে, আনারস আর লেবু—এই সব

॥ ফল ॥
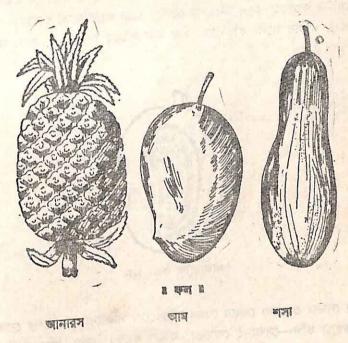
ফলের ভেতর রস আছে। এইজন্যে এগুলো সরস ফল। সুপারি, শিম, মটর ইত্যাদি নীরস ফল। আম, জাম, লিচু—এদের একটা করে বীজ বা আঁটি; এজন্যে এদের **একবীজ ফল** বলে। শসা, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা ইত্যাদি ফলে অনেকগুলো বীজ থাকায় তাদের **বহুবীজ ফল** বলা হয়। এই সব বহুবীজ ফল কাটলে দেখা যায় বীজগুলো কেমন সুন্দরভাবে ফলের মধ্যে সাজানো রয়েছে।

একটা আম মাঝামাঝি চিরে দেখ। দেখতে পাবে, এর ওপরে, খোসা, ভেতরে শাঁস আর একেবারে ভেতরে শক্ত আঁটি। আঁটির মধ্যে বীজ থাকে।

একটা কাঁঠাল যদি মাঝামাঝি কাটা যায় তো দেখা যাবে যে কাঁঠালের বোঁটার অনেকটা অংশ কাঁঠালের ভেতরে ছোট গদার মতো রয়েছে। এর গায়ে শাঁসের সঙ্গে বীজগুলো সার সার সাজান রয়েছে। পাকা আতা

মাঝামাঝি কাটা আম
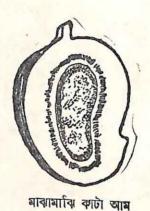
বা নোনার ভেতরও দেখবে কেমন বীজগুলো সাজানো। পেঁপের ভেতর কিছুটা ফাঁপা—সেখানেই পেঁপের বীজ থাকে। কলা আর পেয়ারার বীজ ফলের মধ্যে আলাদা হয়ে থাকে।

মটর শুঁটি লক্ষ্য করলে দেখবে এর ভেতর শাঁস নেই। শুধু খোলা দুটোর মধ্যে বীজ বা মটর দানা সাজানো আছে।

নারকেল, সুপারি ইত্যাদি ফলের ওপর দিক্ ছোবড়া দিয়ে ঢাকা। ভেতরে বীজ বা আঁটি। নারকেলের খোলার ভেতরে যে নরম শাঁস আমরা

খাই সেটা আসলে বীজের একটা অংশ। এটা শিশু-উদ্ভিদের খাবার যোগায়। ওপরের খোসার মধ্যে কোন রসালো জিনিস না থাকায় নারকেলকে

কলা নারকেল পেঁপে
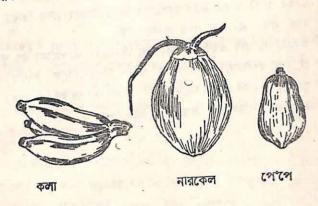
নীরস ফল বলা যায়। স্কুলের সংগ্রহশালায় নানা রকমের ফল সংগ্রহ করে রাখতে পার। নীরস ফল রাখাই সুবিধে; তাড়াতাড়ি পচে যায় না।

উত্তর লেখ

১। গাছের কি কি অংশ আছে? অংশগুলো এঁকে উত্তরের সঙ্গে দেখাও।
২। মস্ আর ফার্নের মধ্যে কি তফাত?
৩। ছোলার বীজ থেকে চারাগাছ জন্মাতে গেলে কি কি অবস্থা দেখতে পাও? গাছ প্রতিদিন কতটা করে বেড়েছে তার মাপ লেখ।
৪। বীজ বোনার আগে জমি চাষ করে কেন মাটি নরম আর ঝরঝরে রাখতে হয়?

৫। লতা গাছ কি কি উপায়ে ওপরে ওঠে?

৬। তিন রকমের পাতা এঁকে দেখাও আর নাম লেখ।

৭। একের বেশী ফলক একটা বোঁটা থেকেই বেরিয়েছে এমন তিনটে পাতার নাম লেখ। ঐ রকম পাতা একটা আঁক।

৮। জবাফুলের ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশ দেখাও। অংশগুলো রঙ কর।

৯। গোলাপ, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, পলাশ, চাঁপা, শিমুল প্রভৃতি ফুলের পাপড়ি কিভাবে সাজান আছে লেখ। ঐ সব ফুলের রঙ কি রকম?

১০। সরস আর নীরস ফল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২

শামুক, মাছ আর ব্যাঙ

আমাদের চারদিকে যেমন গাছপালার অভাব নেই, নানারকমের প্রাণীরও অভাব নেই। খুব ছোট পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে শামুক, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখি, ইঁদুর, গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, মানুষ ইত্যাদি সবই প্রাণী। এ সব প্রাণীর চেহারা আর চালচলন আলাদা। এখানে কয়েকটা প্রাণীর কথা বলা হচ্ছে।

স্থলচর শামুক ঃ বর্ষাকালে বনে-জংগলে, খেত-খামারে, খাল, বিল বা পুকুরে ছোট, বড় নানা রকমের শামুক দেখা যায়। এদের বেশির ভাগই জলের শামুক, তবে কয়েক রকমের শামুক ডাঙাতেও থাকে। একটা

স্থলচর শামুক

স্থলচর বা ডাঙাতে যে শামুক থাকে ধরে এনে ভালো করে দেখ। শামুকের দেহের ওপর দিকে শাঁখের মতো দেখতে পাকানো একটা শক্ত খোলা; এই খোলার মধ্যে শামুকের নরম দেহ। ঐ খোলাটাই শামুকের বাসা, ভয় পেলে সমস্ত দেহটাই খোলার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। দেহের নিচে মোটা একটা অংশ শামুকের পায়ের কাজ করে। ঐ নরম অংশটা মাটিতে ছড়িয়ে

সে খুব আস্তে আস্তে চলে। যে অংশটা পায়ের মতো ব্যবহার করে তার নিচে থেকে একরকম রস বের হয়ে চলার পথ সহজ করে দেয়। তা না হলে শুকনো পথে শামুক চলতে পারতো না।

চলার আগে শামুক আস্তে আস্তে মাথাটা বার করে। মাথার ওপর একজোড়া বড় আর একজোড়া ছোট শুঁড় আছে। শামুক এগুলো দরকার মতো ছোট বড় করতে পারে। লম্বা শুঁড়ের ওপর একজোড়া চোখ আছে। শুঁড় দিয়ে শামুক চলার পথের অবস্থা জেনে নেয়। শামুকের মাথার নিচের দিকে মুখ আর তাতে সরু সরু ধারাল দাঁতের সার আছে। এরা গাছের কচি পাতা খেয়ে বাগানের গাছপালার অনেক ক্ষতি করে।

শামুক বেশির ভাগ রাত্রে বের হয়। এরা শীতকালে মাটির তলায় থাকে। বর্ষায় ছোট ছোট সাদা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

জলের শামুকের চেহারা অনেকটা গোল ধরনের। এদের পায়ের নিচের নরম মাংসের ওপর একটা শক্ত ঢাকনি থাকে। ভয় পেলে নরম দেহ ভেতরে ঢুকিয়ে ঐ ঢাকনা এঁটে দেয়।

মাছ ঃ মাছ আমাদের খুব প্রিয় খাদ্য। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে নদীতে, খালে, পুকুরে, মাঠের জলে নানা রকমের মাছের খুব ছোট বাচ্চা বা

রুই মাছ

পোনা দেখা যায়। মাছের ডিম থেকে ঐ সব পোনা হয়। মাছ অনেক রকমের আছে। পশ্চিম বাংলায় রুই, কাতলা, মৃগেল বা মীরগেল,

কালবোশ, ইলিশ, ভেটকি, শাল, শোল, চেতল, বোয়াল, পুঁটি, ট্যাংরা, পাবদা, তপ্‌সে, বাটা, পারশে, মৌরলা, শিঙি, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছ দেখা যায়। বেশির ভাগ মাছেরই গায়ে আঁশ নেই। কাঁচের বড় জায়গায়, গামলায় বা চৌবাচ্চায় মাছ জিইয়ে রেখে মাছেদের চলাফেরা সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানা যায়।
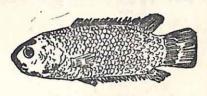
কই মাছ

মাছের মাথার ওপর দু'পাশে দুটো চোখ আর কান্‌কো দিয়ে ঢাকা লাল রঙের ফুলকো রয়েছে। মাছের শরীরে কয়েক জায়গায় পাখনা রয়েছে। কান্‌কোর আর পেটের দুপাশে এক জোড়া করে পাখনা। এই চারটে পাখনা মানুষের হাত-পায়ের মতো। এ ছাড়া পিঠের ওপর আর পেটের পেছনে একটা করে পাখনা থাকে। সব থেকে বড় পাখনা রয়েছে লেজে। নৌকোর হালের মতো মাছ চলবার সময় এই পাখনা দিয়ে দিক্‌ ঠিক রাখে। পাশের দু-জোড়া পাখনা নৌকোর দাঁড়ের মতো কাজ করে—এগুলো দিয়ে মাছ জল কেটে চলতে পারে। মাছের শরীরে শিরদাঁড়া আছে; শামুকের নেই। কাজেই মাছ শামুক থেকে আর একটু উঁচুদরের প্রাণী।

মাছের নাক আছে। কিন্তু মানুষের মতো ঐ নাক দিয়ে মাছ হাওয়া টেনে নেয় না। মাছ মুখ দিয়ে জল নেয়; সেই জল ফুলকোর ভেতর দিয়ে কানকো দিয়ে বের হয়ে যায়। জলে মেশানো হাওয়া এইভাবে ফুলকোর ভেতরে যায়।

মাছেরা কেউ শেওলা, পচা জিনিস, কেউ বা অন্য মাছ বা ছোট ছোট পোকা ইত্যাদি খেয়ে থাকে। চেতল আর বোয়াল মাছ প্রায়ই অন্য মাছ খায়। পুকুরে এসব থাকলে অন্য মাছ কমে যায়। ভেটকি মাছও অন্য মাছ খায়।

ব্যাঙ ঃ বর্ষাকালে খানা, ডোবা যেখানেই জল জমে সেখানে প্রায়ই ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা অনেকেই হয়তো ব্যাঙের জন্মের কথা জানো না।

কাচের জারে ব্যাঙাচি

মেয়ে-ব্যাঙেরা জলের ধারে আগাছার ওপর ডিম পেড়ে রাখে। অনেকটা জেলির মতো থলথলে জিনিসের ভেতর কালো কালো দানার মতো ডিম-গুলো থাকে। সপ্তাহ দুই পরে ঐ ডিমগুলো ফুটে ছোট ছোট ব্যাঙাচি বের হয়ে আসে। একটা বড় কাচের পাত্রে জল আর শেওলা জাতীয় গাছ রেখে তাতে ব্যাঙের ডিম রেখে দিলে কিভাবে ব্যাঙের বাচ্চা হয় আর বড় হয় তা খানিকটা জানতে পারবে। প্রথমে এদের চোখ, মুখ, হাত, পা কিছুই দেখা যায় না; সামনের দিকে কেবল মাথা আর দেহ আর পেছনের দিকে লেজ। প্রথম কয়েকদিন জলের ভেতর কোনো গাছের ডাল বা পাতার সঙ্গে চুপ করে লেগে থাকে। এই সময় মাথার দুধারে ছোট ছোট

ফুলকো দেখা যায়। এই ফুলকো দিয়ে জলে যে বাতাস মেশানো আছে সেই বাতাস নেয়। আস্তে আস্তে চোখ, মুখ, দেহ আর লেজের জোড়ার
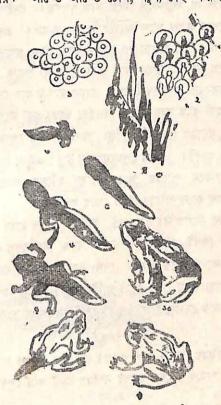
১। ডিম ২। ব্যাঙাচি ৩। ব্যাঙাচি—গাছে লাগা অবস্থায় ৪। ব্যাঙাচির ফুলকো ৫। ফুলকোর লেজ ৬। পেছনের পা ৭। দু জোড়া পা ৮। লেজ রয়েছে ৯। ছোট আকারের ব্যাঙ ১০। পূর্ণ আকারের ব্যাঙ

জায়গায় পেছনের দুটো পা দেখা যায়। তারপর মাথার বাইরের ফুলকোর বদলে মুখের ভেতরে দুপাশে ফুলকো দেখা দেয়। ব্যাঙাচিরা জলের ভেতর শেওলা বা মরা প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে; মাছের মতো ফুলকো

দিয়ে জলে বাতাস নেয়। এই অবস্থায় এদের ফুসফুস গজায়। পরে ফুলকো আর থাকে না, ফুসফুস দিয়ে কাজ চালায়। সেইজন্য নিশ্বাস নেবার জন্যে ব্যাঙেরা মাঝে মাঝে জলের ওপরে আসে। এরপর সামনের দুটো পা দেখা দেয়। দু-জোড়া পা হবার পরও লেজ থাকে; পরে ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। তখন আর এরা জলে না থেকে ডাঙায় উঠে আসে। এই অবস্থায় এরা ছোট ছোট পোকামাকড় ধরে খেতে থাকে; এই সময় একে ছোট ব্যাঙ বলা যায়। দরকার মতো এরা জলে বা ডাঙায় চলাফেরা করে। ব্যাঙের দেহে শিরদাঁড়া আছে। মাছ থেকে এরা আরও একটু উঁচু দরের প্রাণী। এদের পেছনের পা বড়; এজন্য লাফিয়ে দূরে যেতে পারে। পেছনে পায়ের আঙুলগুলো হাঁসের আঙুলের মতো জোড়া বলে সহজেই জলে সাঁতার কেটে যেতে পারে।

আমাদের দেশে কয়েক জাতের ব্যাঙ আছে; এদের মধ্যে কুনো ব্যাঙ আর সোনা ব্যাঙ বেশী দেখা যায়। সোনা ব্যাঙ সাধারণত জলে থাকে; কখনও কখনও জলের ধারে ডাঙায় দেখা যায়। কুনো ব্যাঙ মাটিতে থাকে। এদের সারা গায়ে ছোট ছোট গুটি থাকে। ব্যাঙ জিভ বার করে পোকামাকড় ধরে আর সেগুলো মুখের ভেতর নিয়ে গিলে ফেলে।

উত্তর লেখ

১। শামুকের শরীরের কি কি অংশ আছে? কিভাবে শামুক চলাফেরা করে?
২। যত রকমের শামুক দেখেছ তাদের সম্বন্ধে ছোট করে লেখ আর তাদের এঁকে দেখাও।
৩। তোমরা যেখানে থাক সেখানে কি কি মাছ পাওয়া যায়? এদের মধ্যে কোন্‌গুলো পুকুরের, কোন্‌গুলো নদীর বা বিলের?
৪। মাছের কতগুলো পাখনা আছে? এগুলো কিসের জন্য দরকার?
৫। মাছ আর ব্যাঙ কিভাবে শ্বাস নেয়?
৬। ডিম থেকে ব্যাঙ কিভাবে হয় লেখ আর ছবি এঁকে দেখাও।

পাখি

তোমরা নিশ্চয়ই অনেক রকমের পাখি দেখেছ। এদের গা পালকে ঢাকা। একজোড়া ডানা আর একজোড়া পা সব পাখিরই আছে। ডানার আর লেজের কাছের পালক বড় বড়। ডানায় ভর করেই পাখিরা উড়ে বেড়ায়। আমাদের পশ্চিম বাংলায় দোয়েল, শ্যামা, শালিক, কোকিল, পাপিয়া, বাবুই, বুলবুল, ঘুঘু, ফিঙে, টিয়া আরও কত পাখি আছে। কাক, চড়ুই, পায়রা, হাঁস, মুরগী তোমরা প্রায়ই দেখে থাকবে। এবারে কতকগুলো সাধারণ পাখির সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

কাক : কাক দু'রকমের—দাঁড়কাক আর পাতিকাক। দাঁড়কাক বেশ চকচকে কালো। পাতিকাক দাঁড়কাকের চেয়ে ছোট। এদেরও রঙ কালো,
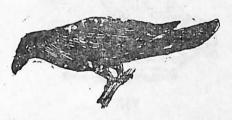
পাতিকাক

তবে ঘাড়, গলা, বুক আর পেটের দিক্‌টা ছাই রঙের। বাড়িঘরের পাশে পাতিকাকই বেশী দেখা যায়। কাক খুব চালাক পাখি ; একটু অসাবধান হলেই মানুষের খাবার নিয়ে পালিয়ে যায়। এদের ভাঙা-গলায় কা-কা ডাকে সকলেই বিরক্ত হয়। কিন্তু মরা আর পচা প্রাণী খেয়ে কাক মানুষের উপকার করে। সারাদিন এখানে ওখানে খাবারের খোঁজে

কাকেরা ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে কোনো উঁচু গাছে, বাড়ির বা মন্দিরের খুব উঁচু জায়গায়, যেখানে সহজে কেউ যেতে পারে না, সেখানে থাকে।

শুধু ডিম পাড়ার জন্যেই কাকেরা বাসা বাঁধে। এরা বাসা ভালো করে বানাতে পারে না। শুকনো ডালপালা, দড়ি, ঝাঁটার টুকরো, লোহার তার ইত্যাদি যোগাড় করে যেমন তেমন ভাবে এরা বাসা তৈরি করে।

চড়ুইঃ দেখতে খুব ছোট হলেও চড়ুই পাখি খুব সাহসী। এরা খুব ছটফটেও। ছেলে চড়ুই পাখির রঙ খয়েরী ; চোখের নিচের খানিকটা

চড়ুই

জায়গা সাদা। মেয়ে চড়ুই পাখির চোখের নিচে ঐ রকম সাদা ডোরা নেই শরীরের রঙও অনেক হালকা। এরা মানুষের ঘরে এসে বাসা বাঁধে। সব সময় ছুটোছুটি আর কিচিরমিচির লেগেই আছে। দেয়ালের ফাটলে, কার্নিসের ধারে, কড়ি-বরগার ফাঁকে, খড়ের ঘরের চালের বাতায় খড়কুটো, ছেঁড়াকাপড়ের টুকরো এই সব দিয়ে এরা বাসা তৈরি করে। এরা ডিম পাড়ে গরমকালে। ফসল খেয়ে এরা মানুষের খুব ক্ষতি করে।

শালিক ঃ নানারকমের শালিক আছে। একরকম আছে মানুষ-ঘেঁষা ; বাড়ির যেসব জায়গায় কেউ সহজে যেতে পারে না সেখানে থাকে। শালিকের শরীরের রঙ তামাটে ধরনের; ঠোঁট, পা আর চোখের নিচের খানিকটা হলদে। চাল, গম, পোকামাকড় ইত্যাদি এদের খাবার। দালানের কার্নিসে, ফাটলে বা বাগানের গাছে খড়কুটো দিয়ে এরা বাসা বাঁধে। বৈশাখ থেকে

শালিক

আষাঢ় মাসের মধ্যে ডিম পাড়ে। কখনও কখনও মানুষের কাছে আসে, সামান্য ভয় পেলেই শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করে উড়ে যায়। এরা প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় থাকে। মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়াও করে।

বাবুই ঃ বাবুই চড়ুইয়ের মতো ছোট পাখি। গড়নও অনেকটা ঐরকম। উঠোনের পাশে তাল, সুপুরি, খেজুর, নারকেল প্রভৃতি গাছে বাবুই বাসা বাঁধে। এদের বাসা ঝুলে থাকে আর ঐ বাসা তৈরি করতে বাবুইরা

যথেষ্ট কেরামতি দেখায়। খড়, সুপারি, নারকেল বা কলার পাতা থেকে আঁশ বার করে এরা বাসা বোনে। বাসাটা দেখতে একটা উল্টানো কুঁজোর মতো। গাছের ডালে বেশ শক্তভাবে ঝোলানো থাকে। বাসায় ঢোকবার

বাবুই পাখির বাসা
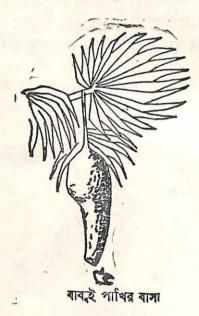
পথ নিচের দিক্ থেকে। বাসার একপাশে ডিম আর বাচ্চা রাখবার জন্য একটা থলি থাকে। এরাও ফসলের খুব ক্ষতি করে।

টুনটুনি ঃ টুনটুনি খুব ছোট পাখি, আকারে চড়ুইয়ের থেকেও ছোট। এরা এত ছোট যে বাগানে ঝোপের মধ্যে বা গাছের ডালপালার আড়ালে এদের খুঁজে বার করা শক্ত। গলার আওয়াজ কিন্তু চড়ুইয়ের থেকে চড়া। টুনটুনিরা টুই-টুই শব্দ করতে করতে গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করে আর খুঁটে খুঁটে পোকামাকড় বার করে

খায়। ঘরের কানাচে, ঝোপের মাঝে এরা বাসা বাঁধে। প্রথমে গাছের পাতা ঠোঙার মতো মুড়ে তার কিনারা গাছের আঁশ দিয়ে আটকে দেয়। পরে এর ভেতর পাখির পালক, তুলো, সুতো, মাকড়সার জাল ইত্যাদি ভালো করে বিছিয়ে পেয়ালার মতো দেখতে বাসা তৈরি করে।

টুনটুনিরা খুব সাহসী। টুনটুনিদের পড়ে থাকা বাসা যদি যোগাড় করতে পার তো দেখবে কত যত্ন করে এই বাসা তৈরি করেছে। পাতা মুড়ে বাসা করে বলে টুনটুনিকে দরজী পাখিও বলে।

টুনটুনি

যেসব পাখি উঁচুতে ওড়ে ঃ আগে যেসব পাখির কথা বলা হল তারা আকাশে খুব উঁচুতে ওঠে না। উঁচুতে ওড়বার তাদের কোনো দরকার হয় না। কয়েকটা পাখি যেমন শকুনি, চিল ইত্যাদি পাখিরা আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়ায়, কেন না উঁচু থেকে তারা দূরের শিকার দেখতে পারে। এই সব পাখির ডানা বড় আর ডানার জোরও বেশী ; তাছাড়া এরা খুব উঁচু থেকেও ভালো দেখতে পায়।

চিল—তোমরা অনেকেই উঁচু জায়গার ওপর চিলকে বসে থাকতে বা দূর আকাশে কত সহজে, সুন্দরভাবে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে দেখেছ। পুকুরে, বিলে, নদীতে মাছ বা ব্যাঙ ভাসতে দেখলেই সোঁ করে নিচে নেমে এসে ছোঁ মেরে শিকার ধরে নিয়ে যেতেও দেখে থাকবে। রাস্তায় বা খোলা জায়গায় মরা কোনো জিনিস পড়ে থাকলেও ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে

চিল

গিয়ে খেয়ে ফেলে। কখনও কখনও লোকের হাতের মাছ, খাবার ইত্যাদিও হঠাৎ ওপর থেকে নেমে এসে নিয়ে পালিয়ে যায়।

শকুনি—এরা সব চেয়ে উঁচুতে উঠে শিকার খোঁজে। অনেক দূরেও এরা দেখতে পায়। মরা জন্তু জানোয়ার দেখলে এরা দলে দলে গিয়ে শক্ত, ধারাল ঠোঁট দিয়ে তাদের মাংস ছিঁড়ে খায়। অনেক সময় নদীতে ভাসছে এমন মরা জন্তুর ওপরও বসে মাংস খাচ্ছে দেখা যায়। চিলের চেয়ে

শকুনি আকারে অনেক বড়। ছবিতে চিল আর শকুনির চেহারার তফাত দেখ।

শকুনি

পাখির পা—সাধারণত পাখির পায়ে চারটে আঙ্‌ল থাকে। তিনটে সামনে আর একটা পেছনে। পেছনের আঙ্‌লটা একটু ছোট। সব আঙ্‌লেই নখ আছে। সব পাখির নখ সমান নয়। কারুর বড় কারুরও বা ছোট। যেসব পাখি শিকার করে তাদের নখ বাঁকা আর ধারাল

হাঁসের আঙুল কিন্তু অন্যরকম—পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। হাঁসের এরকম দুটো পা সাঁতার দেওয়ার সময় নৌকোর বৈঠার মতো কাজ করে।

॥ পাখির পা ॥

হাঁস জাতীয়—শকুনি জাতীয়—মুরগী জাতীয়

পাখির খাবার—পাখিকে কি রকম দেখতে, তাদের শরীরের গঠন, গায়ের রং, ঠোঁট, নখ, পালক, পা, ডানা ইত্যাদি কি রকম, তাদের স্বভাব কেমন জানতে হলে বার বার পাখি দেখা দরকার। বাগানে বা খেলার মাঠের এক কোণে গাছগাছড়ার কাছে একটা ছোট মাচা তৈরি করে তার ওপর রোজ রোজ পাখির খাবার দিলে অনেক রকমের পাখি খাবারের লোভে সেখানে আসবে। খাবারের সঙ্গে কিছুতে করে পাখিদের জন্য জলও রাখা দরকার।

ছোলা, মটর, ধান ইত্যাদি খেতে পায়রা খুব ভালোবাসে। ঘুঘু পাখি কড়াই আর সরষে পছন্দ করে। শালিক চাল, পাকা ফল আর পোকামাকড় খায়, দোয়েল পাখি ফড়িং আর আরশোলা পছন্দ করে। বুলবুল পাকা ফল আর পোকামাকড় ভালোবাসে।

কিছুদিন ধরে পাখিদের খাবার দিলে তাদের ঐ মাচাতে আসা অভ্যেস হয়ে যায় আর কাছে গেলেও তারা ভয় পায় না। তবে কাক আর চিল এরা মাঝে মাঝে এসে ঐ সব খাবার ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তাদের ভয়ে অন্য পাখিরাও পালিয়ে যায়।

উত্তর লেখ

১। তুমি কি কি পাখি দেখেছ? এদের মধ্যে চারটে পাখির গায়ের রঙ পা আর নখ কি রকম লেখ।

২। বাবুই, বুলবুলি আর টুনটুনি পাখির বাসা এঁকে দেখাও।

৩। কাক, হাঁস, মোরগ আর পায়রার পালক কি রকম দেখতে?

৪। পাখি আমাদের কি উপকার আর অপকার করে?

৪

নিশাচর প্রাণী

যে সব জন্তু, জানোয়ার, পাখি রাত্রে ঘুরে বেড়ায় আর দিনের বেলায় ঘুমোয় তাদের বলে নিশাচর প্রাণী। জন্তু জানোয়ারদের ভেতর ইঁদুর, ছুঁচো, খেঁকশিয়াল, বাদুড় ইত্যাদি আর পাখিদের মধ্যে পেঁচা ইত্যাদি নিশাচর।

পেঁচা—পেঁচা নিশাচর পাখি। এর ডাক তোমরা শুনে থাকবে। সন্ধ্যের পর কোথাও এদের উড়ে যেতে দেখতে বা এদের ডাক শুনতে

পেঁচা

পাওয়া যায়। ভাঙাবাড়ির ফাটলে, গাছের কোটরে এদের বাসা। দিনের বেলায় এরা লুকিয়ে থাকে আর রাত্রে শিকারের খোঁজে বের হয়। কাক

পেঁচার শত্রু। দিনের বেলায় পেঁচাকে দেখলে কাকেরা ঠুকরে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। আবার রাত্রে পেঁচারা কাককে পেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।

পেঁচা অনেক রকমের তবে সব পেঁচারই শরীরের তুলনায় মাথা বড়, চোখ দুটো গোল গোল, পাটকিলে রঙের ওপর কালো কালো ফোঁটা বা ডোরা। আমাদের দেশে সাধারণত তিনরকমের পেঁচা দেখা যায়। এক-রকমের পেঁচা দিনের বেলায় পোড়ো বাড়ির ভাঙা দেওয়ালে, বারান্দায় কার্নিসে বা গাছের কোটরে থাকে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির ছাদে বা খুঁটির ওপরেও অনেক সময় বসতে দেখা যায়। এই জাতের পেঁচাই বেশির ভাগ দেখা যায়। এদের মধ্যে যেগুলোর রঙ অনেকটা সাদা তাদের লক্ষ্মী-পেঁচা বলে।

আর এক রকমের পেঁচা খুব বড়। এরা মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি খাওয়ার জন্যে পুকুরের ধারে ভাঙাবাড়িতে বা কোটরে থাকে। এরা হুতুম-ভুতুম শব্দ করে ডাকে বলে এদের হুতুম পেঁচা বা ভুতুম পেঁচা বলে।

আর এক রকমের পেঁচা একটু ছোট দেখতে আর জঙ্গলে থাকে। গভীর রাত্রে এক আধ মিনিট অন্তর কুক-কুক করে ডাকে। কখনও অন্য-রকম আওয়াজও করে। অনেকের ভুল ধারণা যে এই পেঁচা ডাকলে বাড়িতে অমঙ্গল, এমনকি কারুর মৃত্যু হতে পারে। এজন্য একে কালপেঁচা বা মরণপেঁচা বলে।

পেঁচা রাত্রে অন্ধকারে বেশ ভালো দেখতে পায় আর নিঃশব্দে উড়তে পারে—ডানার শব্দ হয় না। অন্য পাখির ছানা, ইঁদুর, ব্যাঙ বা নানারকম পোকামাকড় পেঁচার খাবার। দিনের বেলা কোনো কারণে পেঁচা বের হলে কাক, শালিক প্রভৃতি পাখিরা তাড়া করে।

পেঁচা মানুষের উপকার করে। ইঁদুর ধানখেত আর অন্যান্য জমির

ফসল খেয়ে নষ্ট করে। চাষীরা সেজন্যে মাঠে খুঁটি পুঁতে রাখে। রাত্রে পেঁচা এসে বসে আর ইঁদুর ধরে খায়।

বাদুড়—বাদুড়ও নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় গাছের ডালে পা আটকে মাথা নিচু করে এরা ঝুলতে থাকে। সন্ধ্যের পর দলে দলে বনে আর ফলের বাগানে খাবারের খোঁজে উড়ে বেড়ায়। ডানা থাকলেও বাদুড় পাখি নয়। ডানায় পাখির মতো পালক নেই; পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা। গায়ে লোম আছে। পাখির মতো বাদুড় ডিম পাড়ে না। গরু, ছাগল, কুকুর, ইঁদুর ইত্যাদি জন্তুর মতো এদের একেবারেই বাচ্চা হয় আর

বাদুড়

বাচ্চারা মায়ের দুধ খায়। পাখিদের দাঁত নেই কিন্তু বাদুড়ের আছে। বাদুড়ের দুটো ছোট কান আছে। হাত পা দুই-ই আছে। হাত দুটো ডানার সঙ্গে জোড়া। বাদুড়ের পায়ের আঙুলে পাঁচটা করে নখ আছে। এরা বাসা বাঁধে না। সারাদিন গাছের ডালে মাথা নিচু করে ঝুলতে ঝুলতে ঘুমোয়। বাদুড়ের বাচ্চাগুলো বাদুড়কে আঁকড়ে থাকে।

বাদুড় নানারকমের ফল খেয়ে থাকে; পোকামাকড়ও খায়, কিন্তু ফলই খায় বেশী। বাদুড়ও কয়েক রকমের আছে।

খেঁকশিয়াল—যারা গ্রামে থাকো তারা অনেকেই খেঁকশিয়াল দেখে থাকবে। এরা খুব চালাক আর দেখতে অনেকটা শিয়ালের মতো, তবে লম্বায় আর উঁচুতে ছোট। এদের মুখ সরু লেজে লোমের গোছা থাকে আর দেহটা পাটকিলে রঙের লোমে ঢাকা।

খেঁকশিয়াল

দিনের বেলায় খেঁকশিয়াল বড় একটা বের হয় না। এরা মাটির নিচে গর্ত করে তার ভেতরে থাকে। রাত্রে খাবার খুঁজে বেড়ায়। কুকুর এদের বিশেষ শত্রু। খেঁকশিয়াল ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ার ধরে খায়। গেরস্থর বাড়ি থেকে এরা হাঁস-মুরগী, কুকুরের বাচ্চা ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে গিয়ে খায়।

ইঁদুর—কি শহর বা গ্রামে ইঁদুরের উৎপাত সব জায়গায়। এরাও দিনের বেলায় বড় একটা বের হয় না; গর্তে বা ঘরের জিনিসপত্তরের পেছনে লুকিয়ে থাকে। রাত্রে এদের চলাফেরা আরম্ভ হয়।

বেড়ালের মতো এদের মুখে গোঁফ আছে যার সাহায্যে রাস্তা ঠিক করে নিয়ে চলতে পারে।

ইঁদুর নানারকমের—নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, গেছো ইঁদুর ইত্যাদি। নেংটি ইঁদুর খুব ছোট দেখতে, কিন্তু এদের অত্যাচার খুব বেশী। কাপড়-চোপড়, লেপ-তোষক, বই-খাতা সবই কেটে তছনছ করে। ধেড়ে

ইঁদুর খুব বড় বড় দেখতে হয়। এরা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে না। গেছো ইঁদুর খুব তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারে। এদের চেহারা মাঝামাঝি, আর একটু লম্বাটে ধরনের।

মাঠে যে সব ইঁদুর থাকে তাদের মেঠো ইঁদুর বলে। এরা জমিতে ধান, কড়াই ইত্যাদি খেয়ে ফেলে খুব ক্ষতি করে।

ইঁদুর

ইঁদুরের এক সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা হয়। ইঁদুরের প্রধান শত্রু বেড়াল, কুকুর, চিল আর পেঁচা। ইঁদুর ধরবার জন্য গেরস্থরা নানা রকমের ইঁদুর-ধরা কল পেতে রাখে। আজকাল একরকম জিনিস পাওয়া যায় যা খেয়ে ইঁদুর মরে যায়।

উত্তর লেখ

১। নিশাচর প্রাণী কারা? দুরকমের নিশাচর প্রাণী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। বাদুড়কে কি পাখি বলা যায়? বাদুড়ের সঙ্গে পাখির কতটা মিল আছে আর কতটা নেই?

৩। খেঁকশিয়াল কিরকম দেখতে? এরা যে চালাক কি করে বোঝা যায়?

যে সব প্রাণী শীতকালে ঘুমোয় আর খোলস বদলায়

তোমরা জান কি যে এমন কতকগুলো প্রাণী আছে যারা শীতের ক'মাস চলাফেরা করে না, চুপচাপ ঘুমিয়ে কাটায়। সাপ, ব্যাঙ আর শামুক এই জাতের প্রাণী। শীতের ঠাণ্ডা আর খাবারের অভাব থেকে বাঁচবার জন্যে এরা চুপচাপ পড়ে থাকে। শীতের আগে শরীরে যে চর্বি জমা হয়, তাতেই এদের খাবারের কাজ কতকটা চলে যায়।

ফণা আছে এমন সাপ ফণা নেই এমন সাপ

সাপ—আমাদের দেশে অনেক জায়গাতেই সাপ দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালে এদের দেখা যায়, শীতকালে বড় একটা দেখা যায় না। তখন এরা গর্তের ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। গরমের প্রথমেই গর্ত থেকে সাপ বের হয়ে আসে। শীতকালে অনেকদিন না খাওয়ার ফলে এদের সেই সময় খুবই ক্ষিদে থাকে। সন্ধ্যের পর

থেকেই সাপেরা খাবারের খোঁজে বের হয়। এরা ব্যাঙ, ইঁদুর ইত্যাদি সাধারণত খেয়ে থাকে।

আমাদের দেশে নানারকমের সাপ আছে। তাদের মধ্যে কিছু সাপের বিষ আছে আর কিছু সাপের বিষ নেই। শঙ্খচূড়, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি সাপের বিষ আছে। এদের বিষ খুবই সাংঘাতিক; কামড়ের ফলে মানুষ, জীবজন্তু প্রায়ই মারা যায়। ঢোঁড়া, হেলে, লাউডগা ইত্যাদি সাপের বিষ নেই।

সাধারণত দাঁত ছাড়াও বিষধর সাপের ওপরের চোয়ালের দুদিকে দুটো বড় ফাঁপা দাঁত আছে। এই ফাঁপা দাঁত দুটোকে বিষদাঁত বলে। কেননা বিষদাঁতের পাশে দুদিকে দুটো বিষের থলি আছে। সাপ কারুর গায়ে বিষদাঁত বসিয়ে দিলেই বিষের থলি থেকে বিষ ঐ দাঁতের ভেতর দিয়ে এসে রক্তের সঙ্গে মেশে, আর যার রক্তের সঙ্গে বিষ মিশে যায় সে মারা যায়। সাপুড়েরা সাপের বিষদাঁত তুলে ফেলে খেলা দেখায়।

সাপের হাত বা পা নেই। পেটের তলায় যে আঁশ আছে তার সাহায্যেই চলে। এরা এঁকেবেঁকে চলে। সাপের দেহে আমাদের মতো মেরুদন্ড আছে। এদের দেহ লম্বা আর গোল, মাথা একটু বড় আর লেজ সরু। সারা গা আঁশে ঢাকা। সাপেরা মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে।

সাপ দেখলে আমাদের ভয় হয় বটে কিন্তু এরা মানুষকে ভয় করে। প্রাণের ভয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই মানুষ বা অন্য জন্তু-জানোয়ারকে কামড়ায়।

বেশির ভাগ সাপেরই ডিম থেকে বাচ্চা হয়। কোনো কোনো সাপের একেবারে বাচ্চা হয়।

ব্যাঙ—ব্যাঙের কথা আগেই বলা হয়েছে। শীতের সময় এরা গর্তের ভেতর বা কাদার নিচে ঢুকে থাকে। বর্ষার প্রথম দিকে বের হয়ে আসে। তখন এদের ডাক খুব শোনা যায়।

শামুক—এদের কথাও আগে বলা হয়েছে। বর্ষার সময় ছাড়া শামুক বড় একটা দেখা যায় না। বর্ষার শেষের দিকে খাল, বিল বা পুকুরের জল শুকিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জলচর শামুক পাঁকের তলায় চলে যায় আর ঢাকনা বন্ধ করে অচল অবস্থায় পড়ে থাকে। পাঁক শুকিয়ে গেলেও শামুক শক্ত মাটির নিচে খোলার মধ্যে ঘুমিয়ে বর্ষা পর্যন্ত কয়েক মাস কাটিয়ে দেয়। জমি চাষ করবার সময় এরকম অনেক শামুক মাটির ডেলার সঙ্গে বের হয়ে আসে।

স্থলচর শামুকও শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো কিছুর নিচে থেকে দেহটা খোলার মধ্যে গুটিয়ে নেয় আর খোলার মুখ একরকম আটাল জিনিস দিয়ে বন্ধ করে ফেলে। এইভাবে বর্ষাকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়।

কচ্ছপ—শক্ত খোলস ঢাকা কচ্ছপ নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। এরা গর্তের মধ্যে শীতের সময় ঘুমিয়ে কাটায়।

বেশী শীতের সময় টিকটিকিও কিছুকাল ফাটল বা গর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটায়।

যারা গায়ের রঙ বদলায়—টিকটিকির মতো অনেকটা দেখতে একটু

গিরগিটি

বড় আর এক রকমের প্রাণী আছে; এদের বলা হয় গিরগিটি। এরা বনে জঙ্গলে গাছের ওপর থাকে। এদের চেহারা অদ্ভুত। গায়ের রঙ মেটে

সবুজ; দিনের আলো কমা বাড়ার সঙ্গে ঐ রঙের বদল হয়। মানুষের যেমন রাগ বা ভয় হলে লালচে বা ফেকাসে হয়, এদেরও ঐরকম অবস্থায় রঙের খুব বদল হয়। এইজন্যে এদের বহুরূপী বলে।

উত্তর লেখ

১। কোন্ কোন্ প্রাণী শীতকালে ঘুমোয়? এদের এরকম ঘুমের কি কারণ?

২। কি কি সাপ দেখেছ? এদের মধ্যে দুটো সাপের চেহারা কিরকম লেখ।

৩। বিষদাঁত কাকে বলে? কিভাবে সাপ বিষ ঢেলে দেয়?

৪। শীতকালে শামুক কোথায় কিভাবে থাকে?

৫। গিরগিটি বহুরূপী কেন? গিরগিটির গায়ে কি কি রঙ বদলাতে দেখেছ?